দেওয়াল লিপি

সমরেশ বসু

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

লেখাটা সবাই জানে।

যে লেখে, তাকে দেখতে বড় বাসনা!

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

অগ্রজপ্রতিমেষু

লেখকের অন্যান্য বই

গঙ্গা

ত্রিধারা

ভানুমতী

সওদাগর

তৃষ্ণা

ষষ্ঠঋতু

পশারিণী

মনোমুকুর

শ্রীমতী কাফে, বি, টি, রোডের ধারে ইত্যাদি

গল্পগ্রন্থ

উজান, আইন, দেওয়াল লিপি, বিনিময়,

জয়নাল, আবর্ত, রং, আর এক ছায়া

লেখাটা সবাই দ্যাখে।
যে লেখে, তাকে দেখতে বড় বাসনা।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

অগ্রজপ্রতিমেষু॥

লেখকের অন্যান্য বই—

গঙ্গা

ত্রিধারা

ভানুমতী

সওদাগর

ষষ্ঠঋতু

পশারিণী

মনোমুকুর

শ্রীমতী কাফে, বি, টি, রোডের ধারে ইত্যাদি

গল্পগ্রন্থ

উজান, আইন নেই, দেওয়াললিপি, বিনিময়,

জয়নাল, আবর্ত্ত, রং, আর এক ছায়া

উজান

'শালাদের খালি গান, ফূর্তি, গল্প, ঝগড়া। নিকুচি করেছে তোর—'

ফুঁসতে ফুঁসতে ঘরের নিরালা কোণের অন্ধকার ছেড়ে প্রায় একটা ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মত এসে নারাণ বেমালুম দুই থাপ্পড় কষালে গাইয়ে বেচনের গালে।

বেচনের সঙ্গে সমস্ত আসরটাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল ক্ষ্যাপা নারাণের দিকে। একে শনিবারের সন্ধ্যা, তায় কাল কারখানায় রবিবারের ছুটি। আসরের আর দোষটা কি?

দোষ নারাণেরও বা কোথায়? একে লোকজনই সহ্য হয় না, তায় আবার গান বাজনা, ঢলাঢলি, হাসাহাসি।

এই আধো অন্ধকারে নারাণকে একটা সাংঘাতিক কিছু মনে হয় না। মনে হয় যেন একটা ভূতে পাওয়া মানুষ। চোখে তার ক্ষিপ্ততা নেই, আছে অসহ্য চাপা যন্ত্রণার ছাপ। গোঁফ জোড়া অনেক দিন কাটছাঁট না হওয়ায় অসমানভাবে ঝুলে পড়েছে। মুখের হাড় বেরিয়ে, বাঁকা চোরা অনেকগুলো রেখা সুস্পষ্ট হয়ে তাকে একেবারে বুড়ো করে ফেলেছে এ বয়সেই।

সে চাপা গলায় প্রায় টেনে টেনে আর্তনাদ করে উঠল, 'শালার জগতে লোক-জন, গাড়ি-ঘোড়া, কলকারখানা, গান, সোহাগ আর কাঁহাতক সওয়া যায়? পঙ্গপালের জাত এ মানুষগুলোন শালা একদিনে সাবাড় হয় না কেন? অ্যাঁ, কেন হয় না?'

কিন্তু বেচন ছেড়ে দিলে না। সে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে সজোরে এক ঘুষি মারলে নারাণের মুখে।—'শালা, তবে যা না, সাধু হয়ে বনে বনে ঘোরগে। এখানে কেন?'

সবাই ভাবলে এখুনি একটা মারামারি শুরু হয়ে যাবে এবং একটা সোরগোলও উঠল সেই রকমের। কিন্তু কিছুই হল না। কারণ, নারাণ একেবারে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল মুখে হাত দিয়ে।

আসলে সে তো মারামারি করতে আসেনি, এসেছে আর চুপ করে থাকতে না পেরে। মানুষের কোন কিছুই যে তার আর সহ্য হয় না। কোন বন্ধুর দুটো কথা বল, মেয়েমানুষের একটু হাসি মস্‌করা বল, ছা পোনার একটু সোহাগ বল, মায় কারখানা. কাজ, বস্তি কিছুই ভালো লাগে না। মানুষের সমাজ তার কাছে বিষের মত লাগে। অথচ সে একটা কাজের মানুষ। বনস্পতি ঘিয়ের কারখানায় সে কাজ করে। হাঁকে, ডাকে, হাসিতে, গানে সেও কিছু কম ছিল না।

তবে হ্যাঁ, তখন তার বউ ছিল, তিনটে ছেলে-মেয়ে ছিল। আর বউটা ছিল যেমনি চেহারায় শক্ত, তেমনি এক মুখেই কত কথা, ঝগড়া, হাসি, সোহাগ। তিনটে ছেলে-মেয়ে কাছে কাছে ঘুরত, যেন ধাড়ি শূয়োরের পায়ে পায়ে ফেরা বাচ্চাগুলোর মত।

সেগুলো বছর ভরে ভুগল, পাকিয়ে পাকিয়ে গেল। তারপর মরল একটা একটা করে। আগে যেমন রাগলে নারাণ বলত, 'তোরা মলে আমার হাড় জুড়োয়, ঠিক তেমনি করে মরল। কিন্তু একে ঠিক হাড় জুড়ানো বলে কিনা, সেটা ঠাউরে উঠতে পারল না।

সেই থেকে মানুষই যেন তার কাছে বিষ হয়ে উঠল। মানুষকে সে ঘৃণা করে। গান বাজনা তো দূরের কথা, কোন বউ-সোয়ামীকে এক রত্তি হাসতে দেখলে তার ঠ্যাঙাতে ইচ্ছে করে। আসলে, এ সবই তার কাছে মিথ্যে, ভঁাড়ামি, শয়তানি।

কে নারাণের নাম ধরে ডাকতেই সে আসরের সকলের দিকে

তাকিয়ে দেখল। এর মধ্যে অনেকেই তার প্রাণের বন্ধু, বেচনও তাই। আর সকলেই তার দিকে করুণাভরে তাকিয়ে আছে, যেন সে কেমন অসহায় অস্বাভাবিক একটা জীব। ঝি-বউরা এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন মরদ নারাণের সব শোক পারলে ওরা এখনি হরণ করে নিত।

এতগুলো চোখকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঘৃণায় ও যন্ত্রনায় রি রি করে উঠল তার গায়ের মধ্যে। এখনি হয় তো সবাই তাকে সান্ত্বনা দিতে আসবে, যেন কতই ভালবাসে।

পিশাচতাড়িতের মত সে সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সর্বত্রই মানুষের ভিড়, হাসি, গান, কান্না, মারধোর, হল্লা, যেন প্রেতের তাণ্ডবলীলা, জানোয়ারের সংসার!

শেষটায় সে গেল বাবুসাহেব দীনদয়াল সাহুর কাছে তার ধাপার মাঠের কাজের জন্য। সে জানত বাবুসাহেব এক জোড়া লোক খুঁজছে, স্বামী আর স্ত্রী। নারাণ জোর দিয়ে বলল, সে একলাই সব কাজ করতে পারবে, তবু মাঠের কাজটা তার চাই-ই। যতই অল্প পয়সা হোক, একটা পেট তো! দুনিয়াতে সে কার ধার ধারে? দীনদয়াল ভারী অবাক হলেও কাজটা তাকে দিয়ে দিল।

পরদিনই নারাণ তার খুঁটিনাটি জিনিসপত্র নিয়ে, ইয়ার-বন্ধুদের হাজার অনুরোধ উপরোধ ঠেলে, অমন একটা ভাল কাজ ছেড়ে চলে গেল পূবের জনমানবহীন শূন্য মাঠে।

শহর ছাড়িয়ে রেল লাইন। এপারে ময়লা বিশুদ্ধীকরণের যন্ত্রঘর, ওপারে চারটে বড় বড় পুকুর, তাতে চালান যায় যন্ত্রের ভেতরের সব নির্দোষ শেষাংশটুকু। তারপরেই মাঠ, লোকে বলে ধাপা।

তার পূব সীমানায় একখানি মেটে ঘর। আরও খানিক পূবে মিউনিসিপ্যালিটির সীমান্ত ধরে সুদীর্ঘ গভীর খাদ কাটা। তার ধারে কতগুলো মরকুটে খেজুর আর কুল গাছের ধান ক্ষেতের সীমানা। সেটাও পূবে আর উত্তর দক্ষিণে দিগন্তবিস্তৃত, তার ওপারে ধু ধু করে একটা গাঁয়ের কালচে রেখা।

দীনদয়াল সাহু এবার মাঠের ডাক নিয়েছে, উদ্দেশ্য তরকারি ও পুকুরে মাছের চাষ। চাষ বলতে বেগুন, কপি ইত্যাদি।

এখানে এসে বিস্ময়ে ও আনন্দে নারাণ যেন মাতাল হয়ে উঠল। তার ছোট্ট ঘর, পাশে বিস্তৃত একটি মাত্র পিটুলি গাছ। তারপর যে দিকে চাও শুধু মাঠ আর মাঠ। লোক নেই, জন নেই, নিঃশব্দ, বিস্তৃত, উদার অসীম আকাশ। সেই শূন্যতাকে দু-হাতে সাপটে ধরে সে যেন শিশুর মত বিচিত্রভাবে হেসে উঠল, অসীমের মাঝে সে একান্ত হয়ে গেল যেন নির্জনতার মধ্যে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাকের মত।

কোন ভিড় নেই, কোলাহল নেই, মানুষের সামান্যতম চিহ্ন নেই, এখানে শুধুই সে। নিশ্বাসের পর নিশ্বাসে বুকটা তার খালি হয়ে গেল। ঝড়ের পর এক মহাপ্রশান্তির শব্দহীন নিস্তব্ধতা। সেই শৈশবের কল্পনায় মনে হল, আকাশের অশরীরীরা এখানে এই ঘরেরই আনাচে কানাচে চলাফেরা করেন। আহা! জীবনটাকে যেন ফিরে পাওয়া গেল।

হেমন্তকাল। নারাণের কাজ শুরু হয়ে যায়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রথমে আরম্ভ হয় বেগুনের চারা বোনা, আর একদিকে ফুলকপির। আরো খানিক দীর্ঘ জায়গা তৈরী করে রাখল বাঁধাকপির জন্য। পশ্চিম ঘেঁসে দিল গাজরের বীজ ছড়িয়ে, ঘরের পাশে করল বিলিতী বেগুনের ক্ষেত।

কোনখান দিয়ে সময় কাটে, নারাণ যেন চোখের পলকে ঠাওর পায় না। সেই ভোর থেকে কাজ শুরু হয়। দেখতে দেখতে বেলা হয়। তখন সে রান্না করে। খেয়ে খানিকক্ষণ খাটিয়াটাতে শুয়ে মুখে গামছা চাপা দিয়ে থাকে। তারপরেই আবার কাজ। সন্ধ্যা নেমে আসে, তারই মাথার উপর দিয়ে নানান পাখীর দল বাড়ি ফিরে যায়। সে রেললাইনের ওপারের কল থেকে জল নিয়ে আসে, রান্না করে। তারপর কোন কোনদিন বসে থাকে তার ঝকঝকে উঠোনে খাটিয়া পেতে, নয় তো 'তালা-চাবি-কারিগরি' বা 'স্বাধীন ব্যবসা' নামের বই,

অথবা কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ খুলে বসে। তারপর খেয়ে দেয়ে ঘুমোয়। মাসখানেক পরে কাজ একটু কমে এল তার। যা চাষ হয়েছে এখন তাকে বাঁচানোই সবচেয়ে বড় কাজ। পোকা মারা, আগাছা বাছা, জল নিকাশের পথটা একটু পরিষ্কার করা। জায়গাটাই সারের জমি, তবুও সে নানা রকম সার নিজে তৈরি করে।

এই অখণ্ড নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কোন কোন সময় সে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। হেমন্তের আকাশে থেকে থেকে সাদা মেঘ কেমন করে আকৃতি বদলে ধীরে ধীরে উড়ে যায়, তাই দেখে তার সময় কেটে যায়। কখনো শালিকের ঝগড়া ও ঝুটোপুটি খেলা দেখে হেসে ওঠে। পায়রার ঝাঁক উড়ে আসে, ধাপার মাঠের পোকার লোভে আসে বকের দল। কাঠবেড়ালি এলে তাড়া করে, ওরা কচি পাতা পেলেই সাবড়ে দেয়।

রোজ ভোরবেলা ওই পিটুলি গাছটায় অসংখ্য পাখীর কলকাকলীতে আগে তার ভারী বেজার লাগতো। ভেবেছিল ওটার ডালপালাগুলো কেটে দেবে. যাতে আর পাখী বসতে না পায়। পরে সে পাখীদের এ দাবিটা মেনে নিয়েছে।

সকালবেলার দিকে পশ্চিমের ময়লা-বিশুদ্ধির যন্ত্রটার ওদিকে কিছু কথাবার্তা শোনা যায়, কোন কোন সময় পুবের মাঠ থেকে ভেসে আসে হাঁকডাকের শব্দ, গোরু বাছুরের হাম্বা রব। তার ছোট ঘরটাকে কাঁপিয়ে এবেলা ওবেলা যায় অনেকগুলো রেলগাড়ি। তার এ জনহীন প্রান্তরে আগে এসব বিরক্তির কারণ হলেও এখন আর তার তেমন কোন কৌতুহল নেই, এসব কানেও তেমনি যায় না।

এর মধ্যে বার দু-তিনেক দীনদয়াল এসেছিল। কিন্তু নারাণ এমন ভাবে কোন কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকত যে, দীনদয়ালের বিস্ময় আর বিরক্তির সীমা থাকত না। তবু কিছু বলত না, কারণ, সত্যি একলা মানুষটা কি করে মাটির বুক এত সম্ভারে পরিপূর্ণ করে তুলেছে ভাবলেও অবাক লাগে। নারাণের মাথাটা খারাপ বলে

সে ধরে নেয়। কিন্তু লোকটার আগমনে নারাণের বিরক্তি আরও বাড়ে।

প্রায় রোজই একটা হলুদে কুকুর কোথেকে সকালবেলা এসে তার গা শুঁকতে আরম্ভ করে, খেলার ভঙ্গি করে, ছুটে দাওয়ায় ওঠে। রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। মারলে ধরলেও আবার ঠিক আসে।

গৃহস্থের কোন পোষমানা প্রাণীও এখানে তার অসহ্য লাগে।

শুধু মনটা নয়, চেহারাটাও নারাণের কেমন বদলে গেছে। মুখটা যেন ভাবলেশহীন বোবার মত, সমস্ত নৈঃশব্দ্য যেন সেখানে এঁটে বসেছে। সে নিজে একটি কথাও বলে না, এমন কি একটু গুন্‌গুন্‌ও করে না। তবু এ মাঠ ও আকাশের সঙ্গে যেন তার একটা নিয়ত বিচিত্র ধারার বিনিময় চলেছে, তার কোন শব্দ নেই।

কেবল ভর দুপুরবেলা যখন মাঠ ও আকাশ কেমন ঝিম মেরে থাকে তখন ওই আকাশের বুক থেকে চিলের তীক্ষ্ণ চিঁ চিঁ আর্তস্বরে বুকের মধ্যে কেমন ধ্বক্‌ করে ওঠে। মনে হয় যেন কোন শিশু মৃত্যুযন্ত্রণায় চিৎকার করছে।

এমনি রাতেও যখন কোন পাখী বিলম্বিত সুরে ডেকে ওঠে, তার বুকের মধ্যে যেন দম আটকে আসে। মনে হয়, বুঝি কোন বউ কাঁদছে ক্ষুধা ও রোগের যন্ত্রণায়। তখন সে একটা নিশাচর প্রেতের মত সারা মাঠে প্রায় দাপাদাপি করে ফেরে। মাঠটা যেন তাকে গিলতে আসে।

এই সঙ্গেই কতগুলো ছবি পর পর তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার ফেলে আসা জীবন, তার পরিবেশ, সে জীবনের ঝড়ো বেগ, তার কলকোলাহল, তার কাজের উদ্দামতা। এক কথায় একটা বন্যার পাগলামি।

কিন্তু আবার তার মনটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সে নতুন করে সীম, লাউয়ের মাচা বাঁধতে আরম্ভ করে, উত্তরের তে-কোণ জমিটাকে তৈরী করে মটরশুঁটির জন্য।

হেমন্ত গিয়ে শীত এসে পড়ে।

পাতাল থেকে কচি শিশুর মুখের মত যেন একটু একটু করে ফুলকপি তার পাতার আড়াল মেলে দেয়। বড় বড় নধর বেগুন উঁকি দেয় বড় বড় পাতার আড়াল থেকে। অনুক্ষণ সতর্ক থাকতে হয় ইঁদুর আর বেজীর জন্য। সোনার মত গাজরগুলোর জন্য ওদের নোলা ছোঁক ছোঁক করে।

তারপর কাজের শেষে সেই আকাশের মুখোমুখি বসে থাকা, এই প্রকৃতিরই একজনের মত মিশে যাওয়া। একি জীবনের গা মেলে দেওয়া, শূন্যের মাঝে হারিয়ে যাওয়া বোঝা যায় না।

আরও একটা মাস কেটে গেল।

এমনি একদিন সকালবেলা বাঁধাকপির গোড়াগুলোতে সে মাটি তুলে দিচ্ছে। এমন সময় দেখল, ধাপা ও ধানক্ষেতের সীমানায়, যেখানটায় খাদ খুব সরু এবং ঝোপঝাড়শূন্য খানিকটা ফাঁকা, সেখান দিয়ে একটা মেয়েমানুষ কোলে একটা বছর দু-তিনেকের বাচ্চা ও মাথায় একটা শাকের চুবড়ি নিয়ে লাফ দিয়ে তার সীমানায় এসে পড়ল। নারাণের মনে হল, লাফটা যেন তার বুকেই পড়েছে। অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ চোখে সে ব্যাপারটা দেখতে লাগল।

মেয়েমানুষটি নারাণকে দেখতেই পায়নি। সে তার কালো শক্ত পুষ্ট শরীরে দৃঢ় পদক্ষেপে, ডাগর ডাগর চোখে কিছুটা বিস্ময় কিছুটা কৌতূহল ও সংকোচ নিয়ে সোজা নারাণের উঠোনে গিয়ে প্রথমে ছেলেটাকে নামাল, তারপরে শাকের চুবড়িটা। সেয়ানা বয়স, কপালে সিঁদুর নেই। সে কয়েকবার উঁকি ঝুঁকি দিল, জিভ টেনে আপন মনে বুঝি একটু হাসল, তারপর এই মাঠের সমস্ত নৈঃশব্দ্যকে যেন মুহূর্তে ঝংকৃত করে তার সরু মিষ্টি গলায় ডেকে উঠল, 'কই গো, কেউ নেই নাকি?'

সে শব্দে যেন মাঠটা হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠল।

নারাণ তো ক্ষেপে বারুদ। দীনদয়ালই যেখানে পাত্তা পায় না

সেখানে কিনা একটা মেয়েমানুষ, একেবারে বাচ্চা নিয়ে! সে রাগে খ্যাঁক খ্যাঁক করতে করতে একেবারে হামলে পড়ল এসে, 'কেন, কেন? কাউকে দিয়ে তোমার কি দরকার?'

খ্যাঁকানি শুনে বাচ্চাটা চমকে মাকে জাপটে ধরল। মেয়েটিও একেবারে ভড়কে গিয়ে প্রায় ডুকরে উঠল, 'ওমা! এ কেমন মিন্‌সে গো বাবা!'

নারাণও যেন স্বপ্নের ঘোরে এক যুগ পরে নিজের গলার স্বরে চমকে গেল। তবুও খিঁচিয়ে উঠল, 'যেমন হই। তোমার দরকারটা কি?"

কিন্তু সেই ডাগর চোখে ও মিঠে গলায় ভয় ফুটল না যেন তেমন। বলল, 'দরকার আবার কি, বাজারে যাব এট্টু শাক মাক বেচতে, এখান দিয়ে অল্পে হুস্ করে যাওয়া যায়, তাই।'

কর্কশ গলায় ভেংচে উঠল নারাণ, 'আর হুস্ করে যায় না, ওই ঘুর পথেই এট্টু ঠায়ে যেও।'

মেয়েটি জ্র তুলে বাঁকা চোখে এক মুহূর্ত নারাণকে দেখে, এক হ্যাঁচকায় চুবড়িটা মাথায় তুলে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'এঘরে একদিন আমিই ছিলুম, ছিলুম আমার সোয়ামীর সঙ্গে। তার আবার অত কথা কি? মানুষটা মল, তাই, নইলে...'

মনে হল ওর গলার স্বরটা ভেঙে আসছে। 'এখন শাক ঢেরো বেচে খাই...'

'থাক্'। চেঁচিয়ে উঠল নারাণ, 'এখন পথ দেখ। শালা যত ঝুট ঝামেলা......।'

মেয়েটি আর একবার তার ভেজা চোখে নারাণের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে ছেলে কোলে নিয়ে ফর্‌ফর্ করে চলে গেল পশ্চিমে।

নারাণের গায়ে যেন বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে ওই আপদটা, এমনি করে গা ঝাড়তে লাগল সে। মনে হল তার সমস্ত মাঠটা যেন লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে একেবারে এমনি ভাবে সে ঘুরে ঘুরে তার বেগুন, কপি

দেখতে থাকে। দীর্ঘদিন পরে তার নিঝুম শান্তিকে ছরকুটে দিয়ে গেল মেয়েমানুষটা।

কিন্তু একটু পরেই আবার তার সে প্রশান্তি নেমে এল, নিস্তরঙ্গ হয়ে এল সমস্ত কিছু। দিনের শেষে সন্ধ্যা আকাশ নেমে এল হাতের কাছে। আর মৌন সন্ধ্যায় রোজকার সেই বিটুলে পাখীটা ডিগ্ বাজি খেয়ে ডেকে হেঁকে চলে গেল। ঝরে পড়ল পিটুলির পাতা।

আশ্চর্য! পরদিনও সকালে মেয়েটা এল এবং পূবপ্রান্তে সীমের মাচার কাছেই একেবারে নারাণের মুখোমুখি দেখা।

আর যায় কোথায়। নারাণ খ্যাঁক্ করে উঠল, 'ফের?'

মেয়েটার চোখে প্রায় হাসিই ফোটে বুঝি। বলে, 'এই মরেছে। তা চটো কেন?'

নারাণ আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'চটি কেন?'

ছেলেটা মায়ের কোলে কুঁকড়ে যায়। মেয়েটাও হাঁপায়। পথের আলে শিশিরে ভেজা পা দুখানি ধুয়ে গিয়েছে। মুখ চোখও যেন ভেজা ভেজা। গায়ে জামা নেই, শাড়ীটাই জড়ানো। তাতেই যেটুকু শীত মানে। গলায় আবার একটা পেতলের হার। বলে, 'তা অতটা ঘুরে যাওয়ার চেয়ে—'

'সবাই যায়।' ধমকে উঠে নারাণ।

'তা বলে আমিও যাব?' ভ্রূ তুলে কথাটা বলেই ছেলেকে নামিয়ে, মাথার বোঝাটা নামায়। কোমরে হাত দিয়ে বলে, 'বাব্বা! কম পথ? কোমর যেন ধরে যায়। পথে এট্টু জিরনোও হয়। আর ...এলে পরে এখানটায় না এলে মনটা কেমন করে।'

নারাণের বুকের মধ্যে কেমন ধ্বক্ ধ্বক্ করে। যেমন চিলের ডাকে করে ওঠে। কার কথা যেন তার বারবারই মনে আসতে থাকে আর রাগে বিরক্তিতে তার মেজাজ চড়ে যায়।

মেয়েটা বলেই চলে, 'তা-পরে জানো, মিনুসেটা ভারী বোকা ছেল। পশ্চিমে দিলে উনুনের জায়গা করে। তা সে বোশেখী রাত

ঝড় জল মানবে কেন? আবার আমি উত্তুরে উনুন পাতি, তবে না তুমি ওখানে খুন্তি নাড়তে পার। তা তোমার বুঝি বউ টউ—'

'দুত্তেরি তোর বউয়ের নিকুচি করেছে।' রাগে চিৎকার করে ওঠে নারাণ, 'তুমি ভাগবে কি না। শালা যত আপদ এসে জুটবে এখানে।'

অমনি মেয়েটার চোখেমুখেও রাগ ফুটে ওঠে। বলে, 'অমন মানুসের মুখ দেখতে নেই।'

বলে ছেলে চুপড়ি নিয়ে ফরফর করে চলে যায়। খানিকটা গিয়ে কুঁদুলে মেয়েমানুষের মত ঘাড় বেঁকিয়ে চেঁচিয়ে বলে গেল, 'আমি রোজ যাব, দেখি কি কর তুমি।'

নারাণের ইচ্ছে হ'ল, ছুটে গিয়ে ঠেঙিয়ে দেয়। কিন্তু যায় না।

সকালের ছড়ানো সোনার রোদ যেন কালো হয়ে ওঠে, মেয়েটার গোঁমড়া মুখের মত মাঠটার সমস্ত নীরবতা ও সৌন্দর্য যেন কোথায় উবে যায়। আজ এ মাঠের সঙ্গে মনটাকেও তার লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গিয়েছে, এমনিভাবে সে অনেকক্ষণ ছটফট করে ঘোরে। শহরের সেই ঘুপচি ঘরটায় একপাল ছেলেমেয়ে আর একটি বউয়ের কথা বারবারই তার মনে আসে আর বলে, 'ভ্যালা আপদ এসে জুটেছে। টকের জ্বালায় পালিয়ে এলুম, তেঁতুত তলায় বাস! শালার দুনিয়ায় কি কোথাও শান্তি নেই?'

কিন্তু একটু পরেই আবার তার শান্তি নেমে আসে। সীমাহীন নৈঃশব্দ্যের মাঝে আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলে, নিজেকে ছড়িয়ে দেয় সারা মাঠে। দাঁড়ায় আকাশের মুখোমুখি, চুপচাপ রাঁধে খায়। পিটুলির ঝরা পাতাগুলো তুলে রাখে। গাছটা ন্যাড়া হয়ে যাচ্ছে।

পুবের দিগন্তবিস্তৃত মাঠটা ফাঁকা, ধান কাটা হয়ে গিয়েছে। সেখানে আর কাউকে দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে ফুলকপি আর বেগুন অনেক নিয়ে গিয়েছে দীনদয়ালের

লোক। নারাণ যেন কোলের শিশুকে দেওয়ার মত করে সেগুলো দিয়েছে। আবার সেখানে ভরে দিয়েছে নটে পালং ছড়িয়ে।

এ মাঠের কোথাও শস্যহীন শূন্য থাকবে এটা যেন সে ভাবতেই পারে না। শরতের শুঁয়ো পোকারা রুদ্ধশ্বাস বেদনার ভেতর দিয়ে আদায় করেছে নবজন্ম। নতুন পালকে তারা প্রজাপতি হয়ে ভিড় করেছে সীম লাউয়ের মাচায়।

মৌন রাতের তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে নারাণ, সে ফুলের বাগান করবে এখানে। অজস্র সাদা আর লাল ফুল। তারপর তার ঘুমন্ত চোখের পাতায় কারা এসে যেন নাচানাচি করে। কয়েকটি শিশু, একটি সলজ্জ হাসি মুখ, ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বিয়ে, কারখানা, বস্তি, মৃত্যু আর শ্মশানের চিতার লেলিহান শিখা।

পরদিন সকালবেলা মেয়েটি আবার এল, এবং রোজই আসতে থাকে। আর রোজই চলে সেই চেঁচামেচি, খেঁচাখেচি। যত না খিঁচোয় নারাণ, তত জবাব দেয় মেয়েটা।

মেয়েটি এ ধাপার মাঠে কিছুতেই তার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না। আর নারাণের পক্ষে এ ঝামেলা প্রাণান্তকর।

কিন্তু মেয়েটির এখন ভাব দেখে মনে হয়, নারাণের তর্জন গর্জনকে সে যেন তেমন আমলই দিতে চায় না। শুনুক বা নাই শুনুক, সে নিত্য নতুন প্রসঙ্গ পেড়ে বসে। কোনদিন বলে, 'তা-পরে জানো, একে বর্ষার রাত, তায় ধাপা, মিনসে আর রাতে ফিরল না। আমি তো ব্যথায় উলটি পালটি খাচ্ছি। ভোর রাতে বিয়োলুম এ ছেলে। তাই না এর নাম রেখেছি ধাপা। ও যে ধাপার ছেলে।'

কোনদিন বা কুকুরটাকে দেখিয়ে বলে, 'গাঁয়ের থেকে নিয়ে এসেছিল মিনসে, এই এতটুকুন। নাম ওর রাণ্ডি।' আর কুকুরটারও আজকাল আসা বেড়ে গিয়েছে। ধাপা আর তার মায়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে খেলা করে। মেয়েটি সারা মাঠে চোখ বুলোয় আর বলে, 'তা

বাপু সত্যি, তুমি একটা মিনসে বটে। একলাই যা ফলিয়েছ, চারজনে তা পারে না।'

তারপর একটু বা উৎকণ্ঠাভরেই বলে, 'এ তোমার কি ভুতুড়ে বাই বাপু, ঠাণ্ডার মধ্যে খালি গায়ে কাজ কর? একটা কিছু জড়িয়ে নিতে পার না?'

ধাপার ভয়টাও আজকাল কমে গিয়েছে। সে বেমালুম টলতে টলতে গিয়ে কখনো নারাণের ঘরে ঢুকে পড়ে, কিংবা বড় বড় রক্তহীরের মত বিলাতী বেগুনগুলো ছিঁড়তে যায়।

অমনি নারাণ তেড়ে গিয়ে শক্ত হাতে ছেলেটাকে আছাড় দিতে গিয়েও না দিয়ে ওর মায়ের কোলের কাছে বসিয়ে দিয়ে যায়, আর গালাগালি দিতে থাকে।

তাই দেখে মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে। সে হাসিতে এ নির্জন প্রান্তর যেন শিউরে ওঠে আচমকা। ফিরতি পথেও এখানে হয়ে যায়। আপন মনেই বলে, সেই কখন বেরিয়েছি! দুকুরে দুটো মুড়ি খেয়েছি, এখন গিয়ে রাঁধব, তবে খাব। মোড়লের বাড়িতে ধান ভানা থাকলে তো কথাই নেই। সেই রাত দু-পহরে খাওয়া।'

তারপর পিটুলি তলায় শুকনো পাতার উপর ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে এলো চুল আঁট করে বাঁধে। ঘুমন্ত ধাপাকে হয়তো মাটিতেই শুইয়ে দেয়। তখন যেন তারও নীরব হাওয়ার পালা আসে। নারাণের বিরক্তি-রাগকে তুচ্ছ করে হঠাৎ মিহি ভরাট গলায় বলে ওঠে, 'আর পারিনে এ জীবনের ভার বইতে। মনে হয় এখেনে···অমনি করে সারাটা রাত কাটিয়ে দিই। এই এখেনে···।'

তারপর হঠাৎ নারাণের কাছে ঝুঁকে পরে ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'তা বাপু বলে রাখি, এ ধাপার ব্যামো বড় বিদ্‌ঘুটে। কেমন হাত পায়ের শির টেনে, বেঁকে দুমড়ে মানুষ মরে যায়।' এক মুহূর্ত যেন সে মৃত্যুকে দেখে হুতোশে বলে ওঠে, 'এট্টো সাবধানে থেকো বাপু।'

নারাণের মনে হয় কে যেন তার শ্বাসনলিটা চেপে ধরেছে। মেয়েটির গরম নিশ্বাস আর বিচিত্র ছবি ও কথার গোলমালে তার মাথাটা ঘুরে ওঠে।

সে হঠাৎ আচমকা তেপান্তর কাঁপিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'যাও যাও···যাও এখান থেকে।'

ধাপার মা চমকে ওঠে, বলে, 'আ মলো। এটা কে রে।'···বলে তাড়াতাড়ি ধানকাটা মাঠের ওপর দিয়ে চলে যায়।

উত্তরের হিমেল চাপ ঠেলে হুস্ করে বা একটু দক্ষিণে হাওয়া আসে। পিটুলির পাতা উড়িয়ে, লাউ সীমের মাচা সরসরিয়ে, নটে পালংএর মাথা দুলিয়ে দিয়ে যায়।

তালা কারিগরী আর স্বাধীন ব্যবসার বই খোলাই থাকে কোলের উপর। প্রদীপের শিখা পুড়তেই থাকে। অসীম রাত্রি আর মহাকাশ, মাঠ আর ঘর সব একাকার হয়ে যায়। সংসার নিশ্চল, নিঃশব্দ। এই ভালো, এই শান্তি।

তবু, ধাপার মা-ই বল, আর মেয়েই বল, সে রোজই যায় আর আসে। সেও যেন ওই দক্ষিণ হাওয়ার মত একটু একটু করে উত্তরে চাপ ঠেলে আসছে। রোজ যেন একটা নতুন উপসর্গের মত।

হয়তো ঠাট্টা করে বলেই ফেলে, 'আজকের রাতটা থেকেই যাব।' কিংবা 'তা-পরে জানো, তোমাকে এ ধাপায় দেখে আমার ভারী ভালো লাগে। তবে মানুষটা তুমি ঠিক নও।'

পুঁটকে ধাপাটাও কখন নিঃসাড়ে এসে কৌতূহল বশতঃ নারাণের পায়ের লোম ধরে টান দেয়।

নারাণ দাঁত খিঁচিয়ে ভাবল, শালা তেল দেও, সিঁদুর দেও, ভবি ভোলবার নয়। আচ্ছা! রাত করেই সে খাদটা যেখানে খুবই সরু, সেখানে হাত পাঁচেক লম্বা একটা খুঁটির বেড়া করে দিল। তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমোল।

পরদিন মেয়েটি এসে বেড়া দেখে অবাক হয়ে গেল। যেন

বিশ্বাসই করতে পারেনি, এমনি ভাবে বড় বড় চোখে মাঠের চারদিকে নারাণকে খুঁজতে লাগল।

নারাণ লাউ মাচাটার পেছনেই কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছিল কিছু ধনে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। জেনেও সে ফিরে দেখল না।

মেয়েটি বারকয়েক ডেকে ডেকে চেষ্টা করল ছেলেটাকে বেড়া টপকে এপাশে দিতে। না পেরে আপন মনেই হেসে ফেলল। আবার খানিকটা ডাকাডাকি করেও যখন কিছু ফল হল না, তখন নারাণকে যা-তা বলে গালাগালি দিতে লাগল।

নারাণ লাউ পাতার আড়াল থেকে দেখল, জলভরা দুই ডাগর চোখে মেয়েটা এদিকেই দেখছে কটমট করে, আর বলছে, 'ধাপার ভূত কম্‌নেকার, ওকে যেন চেরকাল মাঠে মুখ দিয়েই পড়ে থাকতে হয়।'

তারপর ছেলে চুবড়ি নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে হন্‌ হন্‌ করে চলে গেল ধান কাটা মাঠের উপর দিয়ে।

নারাণের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে ওদের চলার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর নিজেরই নিশ্বাসে চমকে উঠে নারাণ দেখল বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে, ধান কাটা মাঠটা ফাঁকা।

যাক্! যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে নিজের কাজে মন দিল। সেই একই কাজ, একই রকম। কেবল নৈঃশব্দ্য যেন আরও ভারী হয়ে এল।

পরদিন নারাণ কাজে হাত দিতে যায় আর চমকে চমকে ওঠে কেবলি। চোখ দুটো বার বার গিয়ে পড়ে ওই বেড়ার গায়ে। ধেনো মাঠটা দুলে ওঠে চোখের সামনে।

তাকিয়ে দেখে বেলা কোনখান্‌ দিয়ে চলে যাচ্ছে, অথচ কাজ কিছুই হয়নি।

হঠাৎ হাওয়া আসে হু হু করে। পিটুলি গাছটায় আর একটাও পাতা নেই। রুক্ষ, রিক্ত।

মাঠটাও কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছে। দীনদয়ালের লোক এসে রোজই শাক তরকারি সীম লাউ নিয়ে যায় বাজারে। এই নিয়ম —যত ফলন, তত বিক্রি।

রাত্রি আর আকাশ যেন বড় তাড়াতাড়ি নেমে এসে সব কিছু গ্রাস করে ফেলে। কেবল বোবা-রাত্রির চোখে ঘুম নেই।

পরদিনও কাজের মাঝেই কেটে যায়। মরশুম শেষ। মাঠ খালি হয়ে আসছে। কেবল অসহ্য যন্ত্রণাভরা একটা পরীক্ষার মধ্যে প্রাণটা দুমড়ে যেতে থাকে। ওই বেড়াটা যেন মাথার মধ্যে খাঁচার মত ঘুরতে লাগল।

সন্ধ্যাবেলা নারাণ নিঃসাড়ে গিয়ে বেড়াটাকে কেটে ভেঙে খুলে ফেলে দিল। দিয়ে তাড়াতাড়ি এসে আবার শুয়ে পড়ল। যেন লুকিয়ে চুরিয়ে সে একটা বন্দীশালার দরজা ভেঙে দিয়ে এসেছে। এসে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

পরদিন পলে পলে বেলা গেল। খাদের ধারে বেড়াহীন কুল খেজুরের ফাঁকা জায়গাটা যেন খাঁ খাঁ করতে লাগল। নিঃশব্দ, শূন্য। কেবল কুল খেজুরের মাথা দুলল হাওয়ায়।

নারাণের চোখ দুটো টন টন করে উঠল। তবু কেউ এল না সেখানে চোখ জুড়োতে।

তেপান্তরের রাত্রি যেন দু' হাতে জাপটে ধরল নারাণকে। অসহ্য ছটফটানিতে একটা বোবা পশুর মত সে অন্ধকারে মাঠ আর ঘর করে বেড়াল।

তার পরদিন দূর আকাশে লেপটানো চিমনির দিকে তাকিয়ে সে স্থির করে ফেলল, শহরে যাবে। শহরে…তার বন্ধু আর পড়শীদের কাছে।

তাড়াতাড়ি একটা চুবড়ি নিয়ে অবশিষ্ট কয়েকটা ফুলকপি থেকে একটা তুলে নিল। একটা বাঁধাকপি, কয়েক সের বেগুন, মটরশুটি, কিছু সীম, একটা কচি লাউ, কিছু নটে পালং।

তারপর স্নান করে, কাপড় পরে, ধোয়া জামাটি গায়ে দিয়ে, মাথায় গামছা জড়িয়ে ঘরে শিকল তুলে দিল। তরকারির চুবড়িটা মাথায় নিয়ে উঠোনে এক মুহূর্তে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে একেবারে পূবের খাদের মুখে গিয়ে দাঁড়াল

কিন্তু শহর যে পশ্চিমে! তা হোক।

ধাপার মা যেমন করে লাফ দিয়ে এপারে পড়ত, তেমনি করে মাথায় বোঝা নিয়ে নারাণ ওপারে লাফ দিয়ে পড়েই একেবারে সিঁটিয়ে গেল। মনে হল, কে যেন হেসে উঠল তার পিছনে। সন্তর্পণে চোখ ঘুরিয়ে এদিকে ওদিকে দেখল কেউ নেই।

দেখে হন্ হন্ করে ধান কাটা মাঠের উপর দিয়ে চলল দূরের ওই গাঁয়ের রেখাটার দিকে। গাঁয়ে যখন পৌঁছুল, তখন অনেক বেলা। ভাবল, কি করে যেত এত পথ? কিন্তু কোথায় বা তার ঘর, গাঁয়ের কোন সীমানায়। অনেক ঘোরাঘুরির পর এক কিষাণ দেখিয়ে দিল, গাঁয়ের বাইরে মাঠের ধারে ধাপার মায়ের ঘর। নারাণ দেখল, ঘর তো নয়! উঁচু ভিটেয় একটা বিচুলির ছাউনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। উঠোনের খুঁটোয় একটা রোগা ছাগল বাঁধা। কটা পায়রা যেন কি খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে। আর ধাপা কালো ন্যাংটা ছেলেটা পায়রাগুলোর সঙ্গে আবোল তাবোল বক্‌ছে।

কিন্তু নারাণকে দেখেই তার চক্ষু চড়কগাছ। সে একেবারে টলতে টলতে হেই মা হেই মা করতে করতে ঘরে ঢুকে কি একটা কথা বার বার বলতে লাগল।

তার মায়ের ভারী গলা শোনা গেল, 'কে-রে।'

নারাণ একেবারে দরজার কাছে এসে মাথার চুবড়িটা নামিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করল। মেয়েটার দিকে একবার চোখ পড়তেই বলে ফেলল, 'এলুম।'

ধাপার মা কাঁথা ঢাকা দিয়ে শুয়েছিল। এক মুহূর্ত নারাণের মুখের দিকে দেখে ঝাঁজ দিয়ে বলল, 'আদিখ্যেতা! কে বা আসতে বলেছে!'

নারাণ চুবড়ি হাতায়, মাটি খোঁটে। খালি বলে, 'এসে পড়লাম।'

কি বলতে গিয়ে আটকে গেল ধাপার মার গলায়। তাড়াতাড়ি মুখটা ঢেকে ফেলে কাঁথার তলায়। কেবল কাঁথার সঙ্গে যেন শরীরটাও ফুলে ফুলে ওঠে।

অনেকখানি সময় চলে যায়। ধাপা হাঁ করে বসে বসে দু'জনকে দেখে।

হঠাৎ নারাণ জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে?'

জবাব আসে চাপা গলায়, 'জ্বর।'

'তা হলে—'

'থাক।' বাধা দেয় ধাপার মা। বলে, 'ওসব বারোমেসে, সেরে যায় আবার।'

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ।

থেকে থেকে খাপ্‌চি কেটে কেটে নারাণ বলে, 'এই······এট্টু সবজি। ধাপা খাবে। তা—তুমি······আর তো তুমি যাও টাও না······'

'থাক', রুদ্ধ গলায় কথাটা বলে মুখের ঢাকনাটা খুলতেই দেখা যায়, মেয়েটার ডাগর ডাগর জলভরা চোখ দুটো কান্নায় লাল হয়ে উঠেছে। বলে কান্নাভরা গলায়, 'কেন······কেন? এমন শেয়াল কুকুরের মত তাড়ানোই বা কেন, আবার······'

বলতে পারে না আর।

নারাণ বলল, তেমনি থেমে থেমে, 'পারলুম না থাকতে।···চলে এলুম।'

তেমনি ফুঁপিয়ে বলে মেয়েটি, 'কেন—কেন এ আদিখ্যেতা?'

নারাণের ঠোঁট নড়ে, থুতনিটা কাঁপে। হঠাৎ ধাপাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মোটা গলায় বলে ওঠে, 'ফাঁকা মাঠ······আর কেউ নেই। লোক নেই······জন নেই······সাড়া শব্দ নেই···শুধু······ শুধু······'

থেমে গিয়ে আবার বলে, 'কাঁহাতক্ পারা যায়···বল ?'

মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে ফিস ফিস্ করতে থাকে, 'কে বলেছে পারতে, ······কে বলেছে ?'

নারাণ তবুও বলতে থাকে, 'আমি···আমি যেন পালিয়ে আছি। ···হ্যাঁ···শুধু মাঠ···ফাঁকা।'

বলতে বলতে একটা নিঃশব্দ অসহ্য গুমোট যন্ত্রণাকে ভেঙে চুরে, লেদ মেশিনের বিরাট পালিশ করা চাকা যেন বন্ বন্ করে তার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। যন্ত্রের ঘর্ ঘর্ শব্দ যেন চাপা পড়া প্রাণের অসীম নৈঃশব্দ্য ও বোবা নিস্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে হেসে উঠল। একটা বিচিত্র ঝোড়ো বেগ. লোকজন গাড়ী ঘোড়া ধূলো ধোঁয়া, হাসি গান কান্না হল্লা তার লুকানো প্রাণটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। সেখানে জীবনের ঝড়। বস্তু, বস্তি, মহল্লা অষ্টপ্রহর কেবলি বাঁচাতে চাওয়া।

নারাণ আপন মনেই বড় বড় চোখে ফিস্ ফিস্ করে উঠল, 'যাব, চলে যাব সেখানে।'

ধাপার মা গালে হাত দিয়ে বলল, 'কোথা ?'

'শহরে······কাজে।' বলে ধাপার মুখটা তুলে বলে, 'যাবি তো রে ধাপা ?'

ধাপা জবাব দিল, 'মার চঙ্গে।'

ধাপার মা মুখ টিপে বলল, 'মরণ!'

বলে চুবড়িটা টেনে নিল কোলের কাছে। বিচুলির ছাউনিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাওয়া।

আইন নেই

বাসকের ঝাড়টা যেখানে সুনিবিড় হয়ে ঘন অরণ্যের রূপ ধরেছে, যেখানে বড় বড় গাম্বিল আর মুচকুন্দ চাঁপা গাছ কয়েকটার কোমর-ধরা ধুতুরার বন বিস্তৃত, সেইখানেই ঝোপের একটি ফাঁকে লক্ষ্য করলে, খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে, সেই অপলক চোখ দুটি দেখা যায়। সেই রক্তাভ ছোট গো-সাপের মতো পলকহীন তীব্র চোখ দু'টি। আর ঠিক তার একটু নীচেই, প্রায় এক ইঞ্চি গোল লোহার নলটাও দেখা যেতে পাবে। যে-নলটার সরু গর্তের দূর অন্ধকারে যেন ভয়ংকর একটা কিছু লুকিয়ে আছে মনে হয়। যার লেনিহান জিহ্বা কয়েকবার নলের মুখটা লেহন করে করে পোড়া পাঁশুটে দাগ ধরিয়ে দিয়েছে।

আর হালকা হলেও বারুদের ঝাঁজালো গন্ধ যেন লেগে রয়েছে বাসক ও ধুতুরার লেপটালেপটি ঝাড়ে।

জায়গাটা একটি গ্রামের প্রায়-শেষ, আর মাঠের প্রায়-শুরু। পশ্চিমে আশেপাশে আম-জাম-নারকেল ছাড়াও নানান গাছের ভিড়। আসসেওড়া-কালকাসুন্দি-বাসক-ধুতুরার জঙ্গল। কাছেই একটা পুকুর দক্ষিণ ঘেঁষে। আর পূব দিকে দিগ্‌বিসারি শস্যের ক্ষেত।

মাঘ মাস। বেলা এগারোটার রোদে এখনো সোনার আভাস। চকচকে নীল আকাশের তলায়, সুদূর দিকচক্রবালে গিয়ে ঠেকেছে রবিশস্যের সবুজ মাঠ। মুক্ত অবাধ সেই মাঠ যেন একটি স্বপ্নের মতো দিগন্ত ছুঁয়ে পড়ে আছে। তবু কি একটা আশঙ্কায় যেন তার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে, শিউরে সচকিত হয়ে উঠছে।

সূর্য ক্রমেই মাঝ-আকাশে উঠতে লাগল। ছায়া ক্রমেই ছোট হতে লাগল।

বাসক-ধুতুরার ঝাড়ে সেই গো-সাপের মতো অপলক চোখে পলক পড়ল না। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হ'ল আরো। আরো সতর্কভাবে চারিদিক ছুঁয়ে ছুঁয়ে এল। পোড়া পাঁশুটে অন্ধকার নলটা নিঃশব্দে রইল প্রতীক্ষা করে।

পুকুরে এসে মেয়েরা জল নিয়ে গেল। হেসে হেসে অনেক কথা বলে চান করে গেল। দু'জন কিসান এসে দাঁড়াল বাসকঝাড়ের সেই নলটার মুখ বরাবর। কি যেন বলাবলি করল, তারপর চলে গেল মাঠের দিকে। একটু পরে সেখানে এসে দাঁড়াল একটি আদিবাসী যুবতী মেয়ে, কৃষিমজুরনী। তার পিছন পিছন একটি লোক। গলায় কণ্ঠি, গায়ে ফতুয়া। দোকানদার কিংবা মহাজন হবে।

মেয়েটার চোখে ভয়। ভয় চাপার হাসিটাও আছে ঠোঁটে। মেয়েটা সরে দাঁড়াল পথ ছেড়ে, বাসকের ঝাড়ে প্রায় নলটা ঘেঁষে। লোকটাও দাঁড়িয়ে পড়ল।

মেয়েটার মাথা নীচু। লোকটা চোখ দিয়ে যেন চাটছে ওর পুষ্ট শরীরটা। লোকটা বলল, কি হল্য, দাঁড়িয়ে পড়লি যে?

মেয়েটা ভীরু চোখে গ্রামের পথের দিকে দেখল তাকিয়ে। কেউ নেই। তবু সরোষেই বলল, তু যা না।

লোকটা লাল দাঁত বের করে হেসে বলল, আমি তো যাবই। তুই যে বাজারে যাচ্ছিলি? চল্?

মেয়েটা তবু বলল, তু যা না কেনে?

—আমি তোর সঙ্গেই যাব।

বলে পকেট থেকে দু'টি টাকা বের করল। বলল, নে, তেল কিনিস, সাবান কিনিস। লাগলে আরো দেব'খনি...

ততক্ষণে মেয়েটা হনহন করে গ্রামে ঢোকার পথ ধরেছে।

লোকটাও পিছন নিতে গিয়ে থমকে গেল। চিৎকার করে ডাকল, এই এই রে, অই ছুঁড়ি, শোন্ না লো!

মেয়েটা প্রায় ছুটতে ছুটতে গ্রামে ঢুকে গেল। লোকটা দাঁতে

দাঁত ঘষে টাকা দু'টি পকেটে রাখল। বলল, উহুঁ! ছুড়ির দেমাক দেখ্যে বাঁচি না। বলে, তোর মত কত এল, কত গেল। বলে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

বাসক-ধুতুরার ঝাড় অনড়। রক্তাভ পলকহীন চোখ দুটি, চলে-যাওয়া লোকটার দিক থেকে মাঠের ওপর গিয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই একটি আমগাছের পাতা নড়ে উঠতেই চোখ দুটি সেদিক গেল। দুটো ডাকপাখি উড়ে গেল। এক ঝাঁক শালিক উড়ে এসে বসল বাসক-ঝাড়টার কাছে। বসতে না বসতেই হঠাৎ যেন কি টের পেয়ে থমকে গেল সবাই। বোধহয় বারুদের গন্ধটা টের পেল। কিংবা আগুনের ঝাপটা-খাওয়া মারণ-নলটা পেল দেখতে। চোখের নিমেষে উড়ে গেল সব। মুচকুন্দ চাঁপার মাথায় মরসুমের অগ্রিম কোকিল একটা সবে ডাক ছেড়েছিল। সেও পালিয়ে গেল।

আবার নিস্তব্ধ ঝিঁঝিঁর ডাক।

সূর্যটা টাল খেয়েছে পশ্চিমে।

হঠাৎ অনেকগুলি ছোটবয়সী ছেলের চিৎকার শোনা গেল। চিৎকারটা গ্রামের ভিতর থেকে ছুটে আসছে এই দিকেই।

বাসকের ঝাড় এবার দুলে উঠল। সেই চোখ দু'টি নিয়ে একটা মুণ্ডু উঠে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। আর নলের পিছনে, লোহার বাঁকা আংটায় মোটা তর্জনী বসেছে চেপে। নজর ওঠানামা করছে মাটিতে ও গাছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, একটা বকনার পিছনে ছুটেছে একদল ছেলে। ছুটতে ছুটতে চলে গেল বাসকের ঝাড় ঘেঁষে।

ঝোপের ভিতর থেকে অপলক রক্তাভ চোখ আর নল দুই-ই বেরিয়ে এল এতক্ষণে।

একটি লোক, হাতে গাদা-বন্দুক।

চেহারা দেখে লোকটির বয়সের হিসাব পাওয়া দুরূহ। সেই সঙ্গে বন্দুকটারও।

একরকমের লোক আছে, কখনো মোটা হয় না, কিন্তু সুস্থ এবং শক্ত, লোকটি সেইরকম। রোগা, লম্বা কিন্তু শক্ত। শুধু হাড়ের ওপর চামড়া মনে হলেও, সে হাড় চওড়া। এবড়োখেবড়ো একটি লম্বা কালো রঙের পাথরের মতো শরীরের গা বেয়ে মোটা মোটা স্ফীত শিরাগুলি হাত-পায়ে-কপালে যেন শিকড় ছড়িয়েছে। চেহারাটি তাতে রুক্ষ এবং নিষ্ঠুর মনে হয়। মাথার চুল শক্ত খোঁচা-খোঁচা, উসকো-খুসকো, তেল পড়েনি বোধহয় অনেক দিন। চোখ দুটি প্রায় গোল, ছোট। হয়তো রাত জাগতে হয়েছে, তাই লাল। লাল আর সাপের মতো অপলক শুধু নয়। একটি তীক্ষ্ণ শ্বাপদ অনুসন্ধিৎসায় যেন সব সময় চকচক করছে। তার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে তার চ্যাপ্টা নাক আর স্ফীত পাটা। যেন পাটা ফুলিয়ে সবসময়েই কিছু শুঁকে বেড়াচ্ছে।

এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ির সঙ্গে হাতা-ছেঁড়া হাফসার্ট। সেইটি যেমন তেলচিটে, তার ওপরে একটি মান্ধাতার আমলের বগল-কাটা সোয়েটারও তেমনি। তেলচিটে তো বটেই, রঙটা যে কিসের বোঝবার সাধ্য নেই। ময়লা কাপড়টা হাঁটুর কাছাকাছি উঠেছে। কোমরে অন্ততঃ গুটি দুয়েক মাঝারি পুঁটলি ঝুলছে। তার ওপর দিয়ে একখানি শুকনো গামছা জড়ানো।

বন্দুকের বাটের কাঠের একটি কোণ ভাঙা। ব্যারেল অর্থাৎ নলটিতে মরচে-পড়া দাগ দেখা যায়। একটি পাটের দড়ি দিয়ে কাঁধে ঝোলাবার বেল্টের অভাব মেটানো হয়েছে।

ঝোপের বাইরে এসে, প্রথমে তার লক্ষ্য পড়ল, গামছায় পিঁপড়ে ধরেছে। লাল লাল বিষাক্ত পিঁপড়ে। বোধহয় কামড়েছেও কয়েকটা। মুখের বিরক্তি ও যন্ত্রণা দেখে তাই মনে হয়।

তাড়াতাড়ি গামছা খুলে, কোমর থেকে একটি ছোট পুঁটলি বার করলে। বলল, উরে শালা!

ওই পুঁটলিতেই পিঁপড়ে ধরে আছে। পুঁটলি ঝাড়া দিল। একটা উৎকর্ষ পচা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

আবার বলল মোটা ঠোঁট কুঁচকে, বড় নোলা না ?

হবারই কথা। কারণ, ওরকম গন্ধজাত কোনো দ্রব্যে পিঁপড়েদের একটা একচেটিয়া অধিকার মানবজাতি মেনেই এসেছে। এক্ষেত্রে অবশ্য অনধিকার চর্চাটাই ধরা পড়েছে, নইলে এরকম টিপে টিপে পিঁপড়ে-গুলিকে মারবে কেন লোকটি ?

পিঁপড়েগুলি মেরে পুঁটলিটা আবার সযত্নে কোমরে গুঁজল সে। দেখা গেল পুঁটলি দু'টি নয়, তিনটি। একটি বেশ বড়। সেটি কোমরে ঝুলছে। আসলে দড়ি দিয়ে ঝোলানো আছে কাঁধে, যে কাঁধে দড়িতে ঝোলানো আছে বন্দুকটা।

আর একটি ছোট পুঁটলিতে হাত ঢুকিয়ে, এক মুঠো চিঁড়ে বার করে মুখে ফেলল লোকটা। আবার পুঁটলি হাতড়ে হাতড়ে ছোট এক টুকরো পাটালি গুড় তুলে কামড়ে নিল একটুখানি।

তারপর চিঁড়ে চিবোতে চিবোতে চারপাশে সে বারকয়েক তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাল। মাঠের দিকে গিয়ে, একইভাবে চারদিক দেখতে দেখতে খানিকক্ষণ চিঁড়ে চিবিয়ে নিল পাটালির টাকনা দিয়ে। আপন মনেই বলল, গেল কই ?

তারপর এগিয়ে গেল সোজা দক্ষিণ দিকে। ওইরকম সতর্ক তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে দেখতে, লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে চলল।

পথে লোক প্রায় নেই। এই সময়টাই পাড়াগাঁয়ের ঠিক দুপুর। সূর্য বেশ খানিকটা হেলে গেছে পশ্চিমে।

অচেনা দু'-একজন যারা দেখল, তারা তাকিয়ে রইল হা করে। আধা-চেনারা বলল, সেই লোকটা না ?

একজন চাষী গোরু নিয়ে ফেরবার পথে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, পাওয়া গেল ?

জবাব দিল বন্দুকওয়ালা, উঁহুঁ।

চাষী বলল, শুনলাম আমোদগঞ্জের দিকে বড় দল নিকি এটটা দেখা গেছে।

—গেছে ?

—শুনলাম।

বন্দুকধারী মাঠের ওপর দিয়ে একবার ফিরে তাকাল পূবদিকে। যেন তিন ক্রোশ দূরের আমোদগঞ্জকে একবার দেখে নিল। তারপর একটা হুঁ দিয়ে এগলো আবার।

চাষীটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে যেন পাগল দেখছে। দেড় মাইল পথ হেঁটে লোকটি মোটরবাসের পথের ধারে হাটের পিছনে একটা মান্ধাতাআমলের একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার সামনে অশোকস্তম্ভ আঁকা সাইনবোর্ড ঝুলছে। লেখা আছে, "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-বিভাগ, মহকুমা অফিস।' ছোট ছোট হরফে আরো যা লেখা রয়েছে, তার মূল কথা হল, সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বীজ ও কৃষি-বিষয়ের সাহায্য এখানে পাওয়া যাবে।

লোকটা উঁকিঝুঁকি মেরে ঘরে ঢুকল। কেউ নেই, অফিস ফাঁকা। টেবিল চেয়ার আলমারি সবই আছে। পলেস্তারা-খসা দেয়ালে নানা চারা আর বীজের ছবি টাঙানো। কৃষি-উপদেশাবলী লেখা ছাপানো পোস্টার।

বন্দুকধারী ডাকল, ছোটবাবু?

পাশের ঘর থেকে জবাব এল, কে?

বলতে বলতেই মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এলেন। পরনে কোটপ্যাণ্ট। ময়লা হলেও পাড়াগাঁয়ের পক্ষে ওতেই অনেকখানি সাহেবিয়ানা হয়েছে। এসেই মুখটা বিকৃত করলেন। বললেন এই যে, এসেছ বাবা কুতুবলাল?

এতক্ষণে বোঝা গেল, লোকটার গলার স্বর অসম্ভব মোটা। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা নেই, কিন্তু পলক কখনোই পড়ে না। শুকনো গালে যে কয়টি ভাঁজ পড়ল আর বড় বড় কয়েকটি খোঁচা খোঁচা দাঁত দেখা গেল, তাকে বোধহয় হাসিই বলা যায়। বলল, এঁজ্ঞে, কুতুবনাল নয়, কুঁচনাল। মানে, কুঁচফল আছে না? কুঁচ? নাল কুঁচ—

ভদ্রলোক ধমকে উঠলেন, আর থাক, ওই হল। কিন্তু কোন নিশ্চিন্দিপুরে ছিলে সারাদিন ?

তেমনি মোটা স্বরে, প্রায় যেন গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলল কুঁচলাল, এঁজ্ঞে, নিশ্চিন্দিপুরে নয়। রন্দাগাঁয়ে শুনলাম একদল এয়েছিল কাল। তাই সাঁইপাড়ার জঙ্গলে—

বুঝেছি।

ছোটবাবুর খিঁচুনি আর বন্ধ হয় না। বললেন, ওদিকে ওমরাহ্‌পুর থেকে সংবাদ এসেছে—বিশ বিঘা জমির যাবত ছোলা আর মটরের চিহ্নও নেই। ওখানকার লোকেরা বলে গেল, বিরাট একদল গোটা ওমরাহপুর, আমোদগঞ্জ, শেরপাড়া সুদ্ধ্‌ এদিকে উত্তরে রন্দাগাঁ, দক্ষিণে নাজ্‌না পর্যন্ত পাক দিয়ে ঘিরেছে। যে কোন সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সবাই লাঠিসোটা নিয়ে তৈরি হয়ে আছে—

ছোটবাবুর কথার মাঝেই কুঁচলালের লাল চোখ দুটি আরো গোল হয়ে উঠল। তার মোটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে প্রায় ঝরে পড়ল, নাজ্‌না ?

—হ্যাঁ নাজ্‌না। সব লাঠিসোটা দা কুড়ুল নিয়ে—বলতে বলতে থেমে গেলেন ছোটবাবু, আর সহসা একটা কুটিল সন্দেহে তার চোখ দুটি কুঁচকে উঠল। কুঁচলালকে একবার খুঁচিয়ে দেখে বললেন, নাজ্‌না তোমার গ্রাম, না ?

—এঁজ্ঞে।

—সেইজন্যে টনক নড়েছে, না ?

—এঁজ্ঞে ?

—তোমার মুণ্ডু।

ছোটবাবু খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ করেই চললেন, নিজের গাঁয়ের নাম শুনেছ, অমনি টনক নড়েছে। এতগুলো গাঁয়ের যে নাম করলাম, তা কিছু নয়। ভাবলাম, কোথায় লোকটার যা হোক তবু একটা বন্দুক আছে, চালাতেও জানে, তাগ্‌বাগও আছে। লাঠিসোটার সঙ্গে একটা বন্দুক থাকলে জানোয়ারগুলো ভয়ও পায়, মরেও দু-চারটে। আর

মারলে যা হোক কিছু পয়সাও পায়। তা নয়—যাক গে, আমার কি? মরবে, নিজেরাও মরবে।

কুঁচলালের এত কথা শোনবার অবসরই ছিল না। সে ততক্ষণে পুঁটুলি খুলতে আরম্ভ করেছে। পুঁটুলি খুলে সে টেবিলের ওপর রাখতে যাচ্ছিল।

ছোটবাবুও ডাকাতপড়ার মতো চিৎকার করে, নাকে রুমাল দিয়ে তখন পেছিয়ে গেছেন কয়েক হাত।—এই, এই ব্যাটা পিশাচ, মাটিতে রাখ্, মাটিতে রাখ।

পুঁটুলিটা খুলে মাটিতেই রাখল কুঁচলাল। আর ভীষণ পচা দুর্গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরে গেল।

ছোটবাবু উঁকি মারলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ক'টি?

—পাঁচখানা বাবু।

ছোটবাবুর মুখে তেমনি বিরক্তি। বললেন, কদ্দিন ধরে সেই পাঁচটিই? তা এই লক্ষ্মণের ফল কি অঙ্গে অঙ্গেই ছিল ক'দিন?

কুঁচলালের অপলক রক্তাভ চোখে বিস্ময় দেখা গেল। বলল, তা বাবু, কোথাও রাখবার যো আছে? বেড়ালে খাবে কি পিঁপড়ে টেনে নিয়ে যাবে, সেই ভয়। শত হলেও হাতের নক্ষী।

ছোটবাবু প্রায় ভেঙচে বললেন, হাতের নক্ষী? দেখি, তুলে তুলে গোন্।

কুঁচলাল প্রত্যেকটি বাঁদরের কাটা-ল্যাজ তুলে তুলে দেখাল ছোটবাবুকে। এক, দুই, তিন……

ছোটবাবু বললেন, হুঁ, বেড়ালের কিংবা আর কোনো জানোয়ারের ল্যাজট্যাজ মিশেল নেই তো?

কুঁচলালের গালে ভাঁজ পড়ল, দাঁত দেখা গেল। এবার চোখের কোলেও ভাঁজ পড়ে তার চোখ দুটি বুজে এল প্রায়। খুবই হাসল কুঁচলাল। বলল. কি যে বলেন বাবু। কিসে আর কিসে। দেখেন না একবার।

চেয়ে দেখলেন না ছোটবাবু। ভাউচারের প্যাড টেনে নিয়ে লিখলেন কুঁচলাল দাস, পাঁচটি বাঁদর মারার পারিশ্রমিক দশ টাকা।

এইটি কৃষিবিভাগের ঘোষিত নিয়ম। পুরস্কার ঘোষণাও বলা যেতে পারে। প্রতি বাঁদর হত্যা পিছু দু'টাকা দেওয়া হবে। চুক্তি অনুযায়ী অবশ্যই জমা দিতে হবে প্রত্যেকটি ল্যাজ, প্রমাণের জন্য।

সম্প্রতি এ অঞ্চলে বানর নিধন যজ্ঞ শুরু হয়েছে। এসব অঞ্চলে বাঁদর চিরকালই শস্য নষ্ট করে। কোনো কোনো বছর একেবারেই সর্বনাশ করে দেয়। বিশেষ করে, এই যাযাবর শাখামৃগবাহিনী যে-বছর দলবদ্ধ সৈনিকের মতো রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে, সে বছর তো কথাই নেই। বন্যা কিংবা পঙ্গপালের আক্রমণের চেয়ে সর্বনাশটা কোনো অংশে কম মারাত্মক নয়। সুদূর অঞ্চল ঘিরে, কোনখান দিয়ে যে তারা সেতুবন্ধ রচনা করে অগ্রসর হচ্ছে কিংবা আলেকজাণ্ডারের বাহিনীর মতো কোন ঝিলমের তীরে এসে ভিড়েছে, টের পাওয়া যায় না। সজাগ এবং সতর্ক তাদের আক্রমণ। সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ে দলে দলে। শস্য খায়, খাওয়ার চেয়ে তছনছ করে, নষ্ট করে বেশী।

এ বছর তো, বটেই, কয়েক বছর ধরেই এ আক্রমণ চরমে পৌঁচেছে।

বিশেষ করে রবিশস্য। ছোলা, মটর, কলাই। তা ছাড়া বেগুন, মুলো, সীম তো আছেই। কলা আর পেঁপের চিহ্ন পর্যন্ত রাখে না। পেঁপে গাছের মুণ্ডুটি ভেঙে তার নরম শাঁসটি খেয়ে, গোটা গাছটিকে ধ্বংস না করে রেহাই নেই।

তাই দিকচক্রবাল-ছোঁয়া সুদূর প্রান্তরে সবুজের সফল স্বপ্ন-গুঞ্জন মাঝে মাঝে এক গভীর শঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে যায়। শিউরে শিউরে ওঠে। কখন, কখন সেই বর্গীরা আসবে।

তাই, সরকারী এগ্রিকালচার বিভাগের এই ঘোষণা। আর এ অঞ্চলে তার প্রধান পুরোহিত বলা হয় কুঁচলালকে। কেননা, লাঠি-সোটা, দা-কুড়ুল, আগুন নয়। তার একটি গাদা বন্দুক আছে।

ছোটবাবু বললেন, নাও, পুঁটুলিটা বেঁধে বাগানের ঘরটায় রেখে এস।

কুঁচলাল যাকে ছোটবাবু বলে, তিনি হলেন আসলে এগ্রিকালচার ইনস্ট্রাক্টর। তার ওপরে আছেন, কৃষিবিভাগের এস-ডি-ও। কুঁচলালের ভাষায় যে বড়বাবু। এস-ডি-ওকে ল্যাজগুলি চাক্ষুষ দেখাবার জন্যই বাগানের ঘরে রাখতে বললেন ছোটবাবু।

কুঁচলাল সেটা হিসেব করেই বলল, বড়বাবুকে দেখাবেন তো? কিন্তুন ছোটবাবু, বাগানের ঘরে ভামেটামে খেয়ে ফেলে যদি?

—ফেয়ে ফেলবে। তা বলে তোমার ও হাতের লক্ষ্মী আমি অফিস ঘরে রাখতে পারব না।

যদিও খুবই অনিচ্ছা, তবু কুঁচলালকে পুঁটুলিটি বেঁধে সেইখানেই রেখে আসতে হল। তারপর ছোটবাবু যখন স্ট্যাম্পপ্যাডটি এগিয়ে দিলেন টিপসইয়ের জন্য, তখন বড় দোয়াতের মধ্যে কলমের অর্ধেক প্রায় ডুবিয়ে তুলেছে কুঁচলাল। আর নিবের ডগা দিয়ে টপটপ করে কালি পড়তে আরম্ভ করেছে।

ছোটবাবু ভ্রুকুটি করে সবই দেখলেন চুপচাপ। কিন্তু কুঁচলালের সেদিকে খেয়াল নেই। যখন কালিভরা হ্যাণ্ডেল, নিবের চড়চড় শব্দে কোয়ার্টার ইঞ্চি হরফে নাম সই শেষ করল, তখন গোটা হাতটি তার কালিতে ভরে গেছে। ভাউচারেও পড়েছে কয়েক ফোঁটা। মোটা হাড্‌সার থ্যাবড়া আঙুলগুলি সে মাথার চুলে ঘষে নিল।

ইতিপূর্বে যতবার সে টাকা নিয়েছে, ততবারই এরকম অঢেল কালি মেখে সই করে নিয়েছে। কথাটা ছোটবাবুর মনে থাকে না। বিনা বাক্যব্যয়ে দু'টি পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন ছোটবাবু।

টাকা দশটি নিল কুঁচলাল।

কিন্তু কাঁধে বন্দুক, বারুদের গন্ধ, শক্ত কালো মূর্তি আর গো-সাপের মতো অপলক চোখে এতক্ষণ যে কুঁচলালকে নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল, সেই কুঁচলালকে হঠাৎ যেন বড় অসহায় মনে হল। কিংবা তার উদ্দীপ্ত

লাল চোখে, ভাগকষা বানর হত্যার বাসনাই দপদপ করে উঠল বা। টাকা দশটির ওপর থেকে অনেকক্ষণ তার নজর সরল না। তারপর পাঁচ ছয় ভাঁজে নোট দুটিকে একেবারে একটুখানি করে, সোয়েটারের মধ্যে ছেড়া কামিজের পকেটে রাখল।

কি ভেবে ছোটবাবু বললেন—মার, মার, বাঁদরের গুষ্টিকে যত পার মার, বুঝলে হে কুতুবলাল!

কুঁচলাল বলল, এঁজ্ঞে। এবার আর ছোটবাবুকে নাম শুধরে দিল না সে। বলল, পনরদিন আগে মেরেছিলাম ছটা, এই পাঁচটা।

ছোটবাবু বললেন, পাঁচটা-ছটাতে কি হবে। শয়ে শয়ে মার, শয়ে শয়ে।

কুঁচলালের গলার স্বর কেমন বসে গেল, শয়ে শয়ে বাবু?

—হ্যাঁ।

মোটা কালো ঠোঁট দুটি জিভ দিয়ে চেটে বলল কুঁচলাল, একশো মারলে, দুশো টাকা হয় ছোটবাবু!

—তাই হয়। একশোতে দুশো, দুশোতে চারশো, হাজারে দু-হাজার। এক হাজার মার না তুমি—বারণ করেছে কে?

ভাবশূন্য অপলক চোখে কুঁচলাল ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। আর বন্দুকের ভাঙা বাটের ওপর তার কালো মোটা থাবাটা যেন নিসপিস করতে লাগল। বলল, এক হাজার?

ঢোঁক গিলে বলল আবার, একশো একাশি টাকা তিন আনা পাওয়া যায় কতকগুলান মারলে ছোটবাবু?

ছোটবাবু ভ্রু কুঁচকে বললেন, একাশি টাকা তিন আনা বাঁদর মারার হিসেব হয় না বাবা! ওটাকে বিরাশি করতে হবে। করলে পঞ্চাশ আর একচল্লিশ, একানব্বইটি বাঁদর মারতে হবে।

মোটা ঠোঁট নেড়ে বোধহয় মনে মনে হিসেব করল কুঁচলাল একানব্বুই কাকে বলে। তারপর বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে বলল, কি করব বাবু, গাদা বন্দুকে সুবিধে করা যায় না। বাপ রেখে গেছল।

ছোটবাবু বললেন, জানি।

কুঁচলাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, পঞ্চাশ বছরের কথা, বাবা ডাকাত মেরেছিল, তাই পেয়েছিল। তখনকার মহকুমা হাকিম নিজে—

ছোটবাবু এবার চেঁচিয়ে বললেন, অনেকবার শুনেছি।

কুঁচলাল বলল, অ!

তারপর গামছাখানি কোমরে জড়িয়ে কুঁচলাল বেরিয়ে গেল। গিয়ে হাটের সীমানা পেরিয়ে আগে পড়ল মাঠের সীমানায়। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসায় আবার তার অপলক চোখ দপ দপ করে উঠল। বাতাসের বুকে নাকের পাটা ফুলিয়ে শুঁকল গন্ধ।

গতি তার দক্ষিণে। কিন্তু বন্দুকের কথাটা সে ভুলতে পারে নি। বাপ তার ডাকাত মেরেই খালাস হয়েছিল। মহকুমা হাকিম তাই এই গাদা বন্দুকটি দিয়েছিল তার বাপকে। কিন্তু বন্দুক কোনোদিন কাজে লাগেনি আর। অ-কাজে লেগেছিল কুঁচলালের। বয়সের একটা গরম নাকি আছে! সেই গরমে সে ওমরাহপুরের বিলে যেত পাখি মারতে। পাখি মেরে মেরে হাত পাকাবার পর, ডাক এসেছিল বাঘ মারার। আমোদগঞ্জে একটা চিতাবাঘ দৌরাত্ম্য করছিল। মিছে বলবে না কুঁচলাল, বেজায় দমে গিয়েছিল প্রাণটা। মনে শুধু একটি কথাই গেঁথেছিল, বয়সটা জোয়ান, বিয়েটাও হয়নি। মরে গেলে আর কোনদিন হবেও না। লোকে বোঝে না, পাখী মারলেই বাঘ মারা যায় না।

কিন্তু বন্দুকের একটা মান আছে। যেতে হয়েছিল কুঁচলালকে। আর সাতদিন পরে, বাঘটাকে সে সত্যি মেরেছিল। তবে পুরোপুরি বন্দুকে নয়। অর্ধেক বন্দুকের গুলিতে, অর্ধেক পিটিয়ে।

তবে, এও মিথ্যে বলবে না কুঁচলাল, বাবু-সাহেবদের মতো শিকার করে বাঘ মারেনি সে। ভয়ে মেরেছিল। প্রাণের ভয়ে যেমন মানুষ সবকিছু করতে পারে, সেই রকম। আমোদগঞ্জের বিল-ঘেঁষা জঙ্গলে, এমন নিঃসাড়ে এসে বাঘটা তার সামনে দাঁড়িয়েছিল, মনে

করলে এখনো থমকে যেতে হয়। তবে, কুঁচলালের মনে হয়, তারা দুজনেই সমান ভয় পেয়েছিল। হাতে যে বন্দুক আছে, সেটাও ভুলে গিয়েছিল সে। লাঠি মনে করে, সেইটি দিয়েই প্রথম আঘাত করেছিল। একবার নয় তিনবার। বাঘটা তার উরুতে থাবা বসিয়েছিল। তারপর গুলি মেরেছিল কুঁচলাল। সেই সময় বন্দুকের বাটটা ভেঙেছিল আর মহকুমা হাসপাতালে তাকে থাকতে হয়েছিল একমাস। মহকুমা-হাকিম শুধু দেখতে আসেন নি, পঁচিশটা টাকা তাকে বখশিস্ দিয়েছিলেন।

উরুর এক খাবলা মাংস গিয়েছিল বটে, তেমনি আমোদগঞ্জের কুসুমকে পাওয়া গিয়েছিল। কুসুমের বাপ এসে তার বাপকে ধরেছিল, —ওই কুঁচলাল বাঘের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাই। ছেলের জমিজমা তেমন নেই সত্যি, তবে বীর, হ্যাঁ বীরপুরুষ।

হ্যাঁ, বীরপুরুষ। গোটা মহকুমার লোকে তখন কুঁচলালকে কুঁচবাঘ বলত।

কুসুমের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কুঁচলালের। তারপরে যুদ্ধ লেগেছিল। সরকার বন্দুকটি নিয়ে নিয়েছিল। তাদের নাজ্না থানাতেই নাকি ছিল।

যুদ্ধ শেষের চার বছর বাদে ফিরে পাওয়া গিয়েছিল বন্দুকটি। কিন্তু বন্দুক হাতে করার সাধ ঘুচে গিয়েছিল তখন।

লাঙল ধরার জন্যে জন্মেছিল কুঁচলাল। বলদের অভাবে জোয়াল কাঁধে করার ভাগ্য নিয়ে বাঁচবার কথা ছিল তার। সেইভাবেই বাঁচছিল।

কিন্তু বাঁচা বড় দায়। দেখেশুনে কুঁচলালের মনে হয়, সব মানুষও কোন দিন বাঁদর বনে যাবে। লুটেপুটে খেয়ে, তছনছ করবে।

এই কথাগুলি বলতে চেয়েছিল সে ছোটবাবুকে। তা ছোটবাবু নাকি শুনেছেন সে-কথা। হবে হয় তো, কুঁচলাল বলেছে সে-কথা ছোটবাবুকে।

সেই থেকে বন্দুক বেড়াতেই ঝুলছিল। নলের মধ্যে আরশোলায় ডিম পাড়ছিল, মাকড়সা জাল ফাঁদছিল, টিকটিকি তার গা বেয়ে বেয়ে শিকার ধরছিল।

মিছে কেন বলবে কুঁচলাল, বন্দুকটার কথা মাঝে মধ্যে তার মনে হয়েছে : সেই যেবারে তার পশ্চিমের মাঠের সাতবিঘা জমি চরণ ঘোষ দলিলের অভাবে নিজের বগলদাবা করলে, বিলধারের সাড়ে তেরো বিঘা জমি নিয়ে নিলে মহাজন সাঁপুই তার বাপের হাতের টিপসই-দেওয়া ঋণের মুচলেকা দেখিয়ে, গত সনের আগের সনে যখন সরকারী বীজধানের ঋণ পাওয়া নিয়ে সরকারীবাবু তাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিল। গত সনের ভাদ্রে সরকারের খয়রাতি ধান দিলে না তাকে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সেই বামুনটা, বললে, 'বউ ছেলে বেচে খেগে যা', তখন বন্দুকটার কথা তার মনে হয়েছে। রক্তে তার আগুন লেগেছে, বুক জ্বলেছে, বড় ঘেন্নায় তখন বন্দুকটায় ঠেসে ঠেসে বারুদ গেদে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করেছে।

কিন্তু আইন নেই। তাই পারে নি।

আইনের মারপ্যাঁচটা কোনদিন বুঝল না কুঁচলাল। কিন্তু সেই মারপ্যাঁচের বাঁধন তার গলা অবধি বেঁধে ঝুলিয়েছে। বাকি আছে, নিদেনের ঘাড় মটাকানোটুকু।

এই কথাগুলি বলতে চেয়েছিল সে ছোটবাবুকে। গতবছর এমন সময়ে যখন সরকারী চাষের দপ্তর থেকে বাঁদর পিছু দু' টাকা মজুরী ঢ্যাঁট্‌রা দিলে, সে সময় সে বেড়া থেকে বন্দুকটা পেড়ে নিয়েছিল আবার। পরিষ্কার করে, ধুয়ে-মুছে, তেল মাখিয়ে আবার সে বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু তখন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে খোরাক জোগাবার একটা প্রেরণা। পাঁচ মাসের চেয়ে বেশী খোরাকি পাবার জমি তার নেই।

কিন্তু আশ্বিন মাসে কোর্ট থেকে শমন এসেছে। জমিদারীপ্রথা নাকি উঠে গেছে, কিন্তু খাস আছে। পাঁচ বিঘার মালিক কুঁচলাল

খাসের প্রজা। জমিদার নয়, 'খাসদারের' পাওনা নাকি একশো একাশি টাকা তিন আনা, আইন-করা হিসেব। হুজুরে নালিশ হয়েছে। অনাদায়ে জমি নীলাম হবে। নীলাম রদের দরখাস্ত করে প্রজা মামলা লড়তে পারে। কিংবা টাকা মিটিয়ে ঘর করতে পারে সুখে। এখন প্রজার মর্জি, কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।

কেন? না, আইন তৈরি হয় প্রজার মুখ চেয়ে। এই টাকাটা শোধ হলে, কিংবা মামলা লড়ে জিততে পারলে কুঁচলাল সরাসরি সরকারের প্রজা হয়ে যাবে। জমিদারকে পাঁচ বিঘের জন্য তেরো টাকা খাজনা দিতে হ'ত। সরকারকে দিতে হবে তেরো টাকা সাড়ে পনেরো আনা। কেন? না জমিদারী উচ্ছেদ হয়েছে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, কুঁচলাল বন্দুকটা টেনে নামাল কাঁধ থেকে। ওগুলি কি দেখা যায় ক্ষেতের মধ্যে? ছোট ছোট জীবগুলি পিলপিল করে ঘুরছে মাঠের মধ্যে? বন্দুক তুলে নিয়ে অপলক চোখে সে নজর করল।

তারপর বোকা-বোকা মুখে হা করে রইল। বাঁদর নয়, গাঁয়েরই কিছু কুচো ছেলেপুলে। আলে খেলে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে গুটি তিনেক হাত তুলে দৌড়ে এল কুঁচলালের দিকেই। ওই তিনটি তার নিজের। এসে ঘিরে ধরল। প্রশ্ন তাদের একটিই, অই গো বাবা, বাবাগো, কটা মারলে এবারে?

কুঁচলাল বলল, হিসেব পরে হবে, এখন বাড়ি চল্। গো-সাপ নয়, ক্ষুধার্ত বাঘের মতো অপলক রক্ত চোখে শিকার খুঁজছে কুঁচলাল। নাকের পাটা ফুলিয়ে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে। কোথায়, কোথায় তারা? —যারা দেবে তাকে একশো একাশি টাকা তিন আনা? নীলাম-রদের দরখাস্ত করেছে কুঁচলাল। সময় চেয়েছে। আর মরণপণ করে, নিরুপায় হয়ে, এই পাঁচ বিঘেতেই কড়াইশুটি আর আলু করেছে। সংসারের যেমন কতগুলি অমোঘ নিয়ম আছে যে, মানুষ মরে, কতুর হয়, ঝড় ভূমিকম্প হয়, তবু দিন যায়, রাত্রি আসে, তেমনি করেই

কুঁচলাল ওই পাঁচ বিঘেতে লাঙ্গল দিয়েছে, বীজ ছড়িয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ঘেঁষা এই দেশের মাটিতে রবি-শস্যের অনেক আশা। ফসল বাঁচিয়ে তুলতে পারলে, আবার আউস ও আমনের জন্য বেঁচে থাকা যায়।

কুঁচলালের যত কলকাটি সব মাটি। ওই বস্তুটি থাকলে সে কিছু সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তার কাচারি নেই, কর্মচারী নেই, দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে আইনের সুলুক সন্ধান করে টাকা তৈরি করতে পারে না। আর খাসের মালিক তৈরি করে উশুল চাইলে, তাকে হাতে পায়ে ধরতে হয়।

নীলাম রদ হয়েছে তার মাঘ পর্যন্ত। মাঘ মাসের আর তিনদিন বাকি। সামনে ফাল্গুন। ইতিমধ্যেই মাঠের কোথাও কোথাও পাঁশুটে ছোপ দেখা যায়।

কিন্তু একশো একাশি টাকা তিন আনা! কুঁচলালের সর্পচক্ষু দপদপিয়ে ওঠে। মাঠের আনাচেকানাচে, গাছগাছালির ঝুপসিঝাড়েও তীক্ষ্ণ চোখে দেখে। খোঁজে যেন শ্বাপদ বুভুক্ষু লালসায়। আর শক্ত করে চেপে ধরে বন্দুকটাকে।

আর একমাস সময় চাইলে পাওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে একনব্বইয়ের এগারো বাদে এখনো চার কুড়ির হিসেবনিকেশ করতে হবে।

খেয়াল নেই, ছেলেদের সঙ্গে কখন বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্বিত পেল কুসুমের ত্রস্ত উৎকণ্ঠিত গলায়, ওকি, অমন করে কি দেখছ তাকিয়ে তাকিয়ে?

কুসুমের দিকে ফিরল কুঁচলাল। চোখের নজর যেন ঠাণ্ডা হল একটু। গালে কয়েকটি ভাঁজ পড়ল। হাসল কুঁচলাল।

কুসুম জানে, কি দেখে আর কিভাবে অমন করে কুঁচলাল। তাই কুসুমের দু'টি ডাগর চোখ ভরে ঘনিয়ে ওঠে অভিমান। বন্দুক কাঁধে কুঁচলালের এই মূর্তি দেখলে তার নাকি বুক কাঁপে, মনটা নানারকম

কু গায়। কুসুম এসে ইস্তক কোনোদিন পাখি মারতে দেয় নি তাকে।

কিন্তু আজ আর কুসুম আটকাতে পারে না। পাখি নয়, আজ যাকে মারে কুঁচলাল, তাতেও খুনেরই নেশা। কিন্তু খুন না করলে নাকি বাঁচা দায়! তাই কুসুমের বুকের কাঁপুনি, নীরব বকুনি, ঘরের কোণে মুখ গুঁজরে পড়ে থাকে। কুঁচলাল চলে যায়।

তবে কি না, মিছে বলবে না কুঁচলাল, কুসুমের মন বুঝে তারো মনটা একটু খারাপ হয়। আমোদগঞ্জের সেই ছেউটি কুসুমের এখন বয়স হয়েছে, পাঁচটি ছেলেপুলের মা হয়েছে। শরীরে পড়েছে বয়সের ছাপ কিন্তু মুখখানি এখনো যেন টসটসে। চোখ দুটি একরকম, তার আর বয়স বাড়ে নি। ওই মুখের দিকে তাকিয়ে কুসুমের কাছে বসে, এখনো কুঁচলাল গান গাইবার আপ্রাণ চেষ্টায় তাই হেঁড়ে গলার চিৎকার থামাতে পারে না।

কুসুমের কথার জবাব না দিয়ে, কুঁচলাল বলল, ঠাণ্ডা পড়ছে, খালি গায়ে বাঁদরগুলান ও পাড়ার মাঠে—

কথা শেষ করতে পারল না কুঁচলাল। কুসুম শিউরে উঠে বলল, কি? কি বললে তুমি?

কুঁচলাল থতিয়ে গিয়ে বলল, কি বললাম আবার?

কুসুমের চোখে তখন জল এসেছে। ছেলেমেয়ে কটিকে বুকের কাছে টেনে রুদ্ধগলায় বলল, যাদের তুমি নিষ্টেপিষ্টে গুলি বিঁধে মার, তা-ই বলে তুমি গাল দিলে ছেলেমেয়েগুলানকে?

কুঁচলাল বলল, এই ত্যাখ—

কুসুম তেমনি কান্না-ভয়ার্ত স্বরেই বলল, আজো এসে ফট্‌কের মা বলে গেল ত্যাখ অমুকে যে প্রাণীগুলানকে মারছে, শত হলেও তানারা ভগমানের বাহন বাপু। মারলে পরে ভগমানের প্রাণে দুঃখু নাগে। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর, বড় যে পাপ হবে।

কুঁচলাল যেন শুনতেই পায়নি কোন কথা। কোমরের পুঁটলিটা

খুলে একবার দেখল। তারপর আবার কোমরে গুঁজে, পকেট থেকে টাকা দশটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ধর।

টাকা নিল কুসুম। কুঁচলাল বলল, যত্ন করে রাখিস। নসু খুড়িকে রাতে শুতে বলিস।

বলে হনহন করে মাঠের পথ ধরল কুঁচলাল।

কুসুম বলল, কি হল?

কুঁচলাল তখন অনেক দূর। বলল, কিছু না।

কুসুমও বুঝল, কি হয়েছে। কুঁচলালও বুঝল। বুঝল, মেয়েমানুষের খালি ওই এক কথা। দিন বোঝে না, ক্ষণ বোঝে না, মন বোঝে না, সংসার বোঝে না। খালি আনুকথা, যে কথায় চিড়ে ভেজে না। এদিকে ভগবানের সুপুত্তুরেরা গোটা চাকলা ঘিরে বসে আছে। তখন আর 'ভগবানের প্রাণে দুঃখু নাগে না।'

শক্ত চোয়ালে, ছুচলো ঠোঁটে কালো এবড়োথেবড়ো মুখটা কুঁচলালের আরো ভয়ংকর হয়ে উঠল। একশো একাশি টাকা তিন আনার কথা কুসুমের কেন মনে থাকে না?

অনেকখানি এসে থমকে দাঁড়ায় কুঁচলাল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় দক্ষিণে ও পূবে। কোন দিকে যাবে। নাজ্‌নার দক্ষিণে জুড়ান গাঁ। কিন্তু ওদিকটার কোনো খবর নেই। পূবে—ওমারহপুর, আমোদগঞ্জ দিয়ে উত্তর বাঁকে শেরপুর ধরে রন্দাগাঁ—এইভাবে নাকি ছড়িয়ে আছে বড় দলটা।

দূর আকাশের কোল দিয়ে নজরটাকে ঘুরিয়ে আনতে গিয়ে কুঁচলাল যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। মনে হয় তার চারদিক ঘিরে ছোট ছোট পিটপিটে গোল চোখ পাঁশুটে জানোয়ারগুলি ঘাপটি মেরে আছে। সতর্ক চতুর চোখে দেখছে তাকেই, আর দূরে, অনেক দূরে সরে যাচ্ছে,—পালাচ্ছে।

দক্ষিণ-পূব ঘেঁসে এগলো কুঁচলাল। নাজ্‌নার সীমানা দিয়ে ওমারহপুর হয়ে এগুবে সে। এগুতে গিয়ে আর-একবার থমকাল

কুঁচলাল। ছায়াটা দেখে পশ্চিমে ফিরল সে। সূর্য ডুবু ডুবু। আকাশ রাঙাবরণ হয়েছে। দিন শেষ হতে আর বেশী দেরি নেই।

না থাক, রাতটা ওমরাহপুর কাটাতে হবে। খোঁজ নিতে হবে সেখানকার লোকের কাছ থেকে।

জমিটা নাবালের দিকে। সামনে একটা খাল আছে। সাপুইদের সর্ষে ক্ষেত অনেকখানি। মুগুরির ফাঁকে ফাঁকে সর্ষে মাথা তুলেছে অনেকটা। হলুদের গোলা ছিটিয়ে দিয়েছে যেন কেউ—এত সর্ষে ফুল। মৌমাছিগুলি এখনো চাকে ফেরবার নাম করছে না। মধু খেয়ে কুল পাচ্ছে না তাই।

খালের সাঁকোর কাছে এসে দেখা হল দুজনের সঙ্গে। নাজ্‌নার লোক।

একজন বলল, আই গো কুঁচোদাদা চললে কোথায়?

—ওমরাপুর।

একজন বলল, গাঁ ছেড়ে চললে? ব্যাপার যা শুনছি, গতিক বড় সুবিধার না। বন্দুকখান নিয়ে তুমি থাকলে তবু এ্যাটটা বল থাকে।

বল পায় লোকে, কুঁচলাল বন্দুক নিয়ে থাকলে। কুঁচলালও বল পায় মনে। আশা হয় কিন্তু দাঁড়ায় না কুচলাল। যেতে যেতেই বলে, ওমরাপুর যাচ্ছি পটল। যদি দেখ, সুমুন্দিরা এয়েছে, তবে ধাওয়া করবে পুব দিকে। ওদিক পানেই থাকব।

লোক দুটি যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বোকার মতো চোখাচোখি করে চলে গেল। মানুষটিকে তাদের কেমন বেঢপ লাগল। যেন নিজের মধ্যে নিজে নেই।

তা নেই। ক্রমেই একটা হত্যার নেশাই যেন চড়ছে কুঁচলালের।

নাজ্‌নার সীমানা পেরিয়ে, ওমরাহপুরের মাঠে পড়ল সে। আকাশটা এখনো লাল। উঁচু জায়গার দাঁড়ালে সূর্যটা বোধহয় এখনো দেখা যায়।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কুঁচলাল। পায়ের কাছে একটা আধখাওয়া

বেগুন। একটু দূরে আরো কয়েকটা। তারপরে আরো। আর সামনেই বেগুন ক্ষেত। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কাদের আক্রমণ হয়েছিল। আর বেশীক্ষণ আগের ঘটনাও নয়।

আততায়ীর ছায়া-দেখে সাপের ফণা তোলার মতো মাথা তুলল কুঁচলাল। বন্দুক নিল ডান হাতে।

কিন্তু আশেপাশে সব নিথর। সামনে একটা বাঁশঝাড়। আশেপাশে অনেকগুলি বড় বড় গাছ গায়ে গায়ে জড়াজাপটি করে আছে। কিন্তু একটি পাতাও নড়ছে না। এ সময়ে পাখিই বড় ডাকে না এমনিতেও। যেন রাত্রি আসার আগে কি ভাবে চুপচাপ। পাখি ডাকছে না, দেখাও যাচ্ছে না বিশেষ।

তবু নিঃসাড়ে এগলো কুঁচলাল, সেই চিতাবাঘটার মতো। কিন্তু তাদের ছায়াও নেই কোথাও। হয়তো এ তল্লাটেই নেই!

গাছগুলি পেরিয়ে খানিকটা জঙ্গল। জঙ্গলের ওপার রাস্তা। জঙ্গল চার পাশেই। সামনে একটা ডোবা। ডোবাটার ডানপাশে একটা উঁচু ঢিবি।

ঢিবিটাকে ডানদিকে রেখে, ডোবার পাশ দিয়ে, ওমরাহপুরের গোরুর গাড়ি চলার সড়ক ধরে এগুলো কুঁচলাল। হঠাৎ ছোট একটি শব্দে কান খাড়া করে থামল সে। সামনের তেঁতুল গাছটির দিকে দেখল। ফাঁকা গাছ।

কিন্তু দৃঢ় সন্দেহে নাকের পাটা ফুলে উঠল কুঁচলালের। সূর্য ডুবছে, এইটা একটা সময়। পা টিপে টিপে তেঁতুল গাছের আড়ালে গেল সে। আর যা ভেবেছিল তাই। ঢিবিটার পশ্চিম-ঢালুতে ধাড়ি আর বাচ্চায় প্রায় সাত-আটজনের একটি দল। ডোবার জল খেয়ে পশ্চিম দিকেই তাকিয়ে আছে। আর চুপচাপ মাথা চুলকোচ্ছে, গায়ের উকুন খাচ্ছে।

ওদের মতো অস্থির প্রাণী, কেন এসময়ে শান্ত হয়ে যায়? কেন হয়ে যায়? কেন তাকায় সূর্যের দিকে? নাম জপ করে নাকি?

মিছে বলবে না কুঁচলাল, তার মনটা একবার যেন কেমন করে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকটা তুলে ধরে সে। আঙুলটা চেপে ধরে ট্রিগারের ওপর। পাঁচবিঘা জমিতে কুঁচলালের কড়াইশুটি আর আলু আছে। খেয়ে তছনছ করবে সেদিন, সেদিনও জানোয়ারগুলি এমনি করেই সূর্য-ডোবা দেখবে। কিন্তু তাড়া খেয়ে কোনদিকে যাবে বাঁদরগুলি? সামনে না অন্যদিকে। কুঁচলালকে টের না পেলে, এদিকেও আসতে পারে। আর একটা সুযোগ নিতে হবে।

কুঁচলাল দেখল, জানোয়ারগুলি হঠাৎ যেন অস্বস্তিতে কেমন করছে। মরণের গন্ধ পাওয়া যায় বোধহয়।

কুঁচলাল তাগ্ কষে গুলি ছুঁড়ল। লহমায় একবার মাত্র দেখল, একটা বাঁদর প্রায় পাঁচ-ছ হাত শূন্যে লাফিয়ে উঠে, পড়ে গেল। ততক্ষণে, কুঁচলাল পুঁটলি থেকে বারুদকাঠি দিয়ে, বারুদ আর গুলি পুরতে পুরতেই ঘন গাছগুলির দিকে অগ্রসর হয়েছে। এত দ্রুত এবং ক্ষিপ্র যেন একটা কালো বেড়াল।

গাছগুলির জটলার দিকেই কয়েকটা বাঁদর দৌড়েছিল চিৎকার করতে করতে, একটু ঘুরে হঠাৎ গাছের ভিড়ের মধ্যে ঢুকতেই, আর একটা গুলি করল সে।

কাক-শালিকের দল চিৎকার জুড়ে উড়তে লাগল। কিন্তু আর একবার গুলি পুরে প্রস্তুত হতে না হতেই বাঁদরের চিহ্ন পর্যন্ত আশেপাশে আর নেই, এটা অনুভব করল কুঁচলাল। তাছাড়া গাছের কোলগুলিতে ছায়া ঘন হয়ে উঠছে, সহজে টের পাওয়া যাবে না।

পুঁটলি হাতড়ে একটা পুরানো ক্ষুর বার করল সে। তারপর গাছের ওপরের মরা বাঁদরটাকে আগে খুঁজে বার করল। পাশ ফিরে শুয়েছিল বাঁদরটা, হাত-পা ছড়িয়ে। আর বাঁদর মরে গেলেই কেমন যেন নরম হয়ে নেতিয়ে যায়।

গোড়ার কাছ থেকে ল্যাজটা কেটে নিয়ে, রক্তটা মাটিতে ঘষে নতুন পুঁটলি করে তাতে রাখল। টিবির মরাটার ল্যাজও কেটে

নিয়ে পুরল পুঁটলিতে। হয়তো মরা বাঁদর দুটিকে রাত্রে শেয়ালে খাবে। আদিবাসীরা পেলে হয়তো নিয়ে যেত।

কুঁচলালের হাতে রক্ত লেগে গেছে। সে মাথা তুলে এদিক-ওদিক তাকাল। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখল, সূর্যটা ডুবে গেছে। কালচে হয়ে গেছে আকাশ।

টিবিটার ঢালুতে দাঁড়িয়ে কুঁচলালও যেন সূর্যডোবা দেখছে। পাখিগুলি নিশ্চিন্ত হয়ে চুপ করেছে এবার। কুঁচলালও মনে মনে বলল, চার কুড়ির দুই হল।

জুড়নগায়ের দিক থেকে একটা গোরুর গাড়ি এল। জিজ্ঞেস করল কুঁচলাল, কোথা যাবে গো।

—ওমরাপুর।

—নিয়ে যাবে?

গাড়োয়ানটা কেমন ভয়-ভয় চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল কুঁচলালকে। যেন ডাকাত দেখছে সামনে। প্রায় নিরুপায় হয়েই বলল, চল।

গাড়িতে উঠল কুঁচলাল। খানিক পরে গাড়োয়ান বলল, কোথা যাওয়া হবে?

—ওমরাপুর।

—নিবাস?

—নাজ্‌না।

গাড়োয়ান এতক্ষণে ফিরল। বলল, তাইতো বলি, কুঁচনাল না?

—হুঁ?

—হাতে রক্ত কিসের?

—বাদরের।

—তাই তো বলি, ব্যাপারখানা কি?

নিশ্চিন্ত হয়ে লোকটা এবার রামসেনানীর কীর্তিকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগল। কোথায় কি কি ফসল নষ্ট হয়েছে। গাড়োয়ান

নিজে একজন চাষী। কুঁচলালদেরই জাতের লোক। রাতের থাকা-খাওয়াটা আজ তার ওখানেই সারুক কুঁচলাল। কেন না শত হলেও, কাজটা তো সকলেরই!

রাত্রিটা কাটিয়ে বেরলো কুঁচলাল। গ্রামের পুবে আর পশ্চিমে শস্যের মাঠ। আগে পশ্চিম দিকটা ঘুরে, পুবদিকে গেল সে। পুবদিকে বিলটা দক্ষিণে জুড়নগাঁয়ের দিকে চলে গেছে। ওদিকটায় লোকজনের চলাফেরা কম।

কিন্তু রাগে মাথায় আগুন জ্বলে গেল কুঁচলালের। একগাদা কুচো লেগে গেছে পিছনে। আর চিৎকার করছে: বাঁদরমারা, বাঁদরমারা!

বারণ করলেও শোনে না। যেন পাগল পেয়েছে। এই দলবাঁধা চেঁচামেচিতে বাঁদর দূরের কথা, কুঁচলালকেই ভেগে পড়তে হবে যে। গাঁয়ের বড়রা বললেও ছানাগুলি শুনতে চায় না। ক্ষেপে গিয়ে ভাবে, দেবে নাকি একটাকে দুড়ুম করে?

কিন্তু কুঁচলালের গালে ভাঁজ পড়ল। মিছে বলবে না সে, নিজের রাগ দেখে তার নিজেরই লজ্জা হল আর নিজের ছেলেমেয়েগুলির কথা তার মনে পড়ল: ছানাপোনাদের এইটি নিয়ম। তাদের মন মানে না!

তাই কুঁচলাল হঠাৎ দৌড়তে আরম্ভ করল। এ-পথে সে-পথে দৌড়ে দৌড়ে পথ ভুলিয়ে দিল বাচ্চাগুলিকে। কিন্তু বিপদ হল অন্যদিক থেকে। গাঁয়ের যত কুকুর লেগে গেল তার পিছনে।

—শালারা পাগল করে মারবে।

একটি বাড়িতে ঢুকে খানিকক্ষণ বসে রইল সে। কুকুরগুলি ফিরে গেলে আবার বেরলো।

বেরিয়ে সোজা চলে গেল আগে পুবে, তারপর দক্ষিণে। জুড়নগাঁয়ের সীমানা থেকে আবার উত্তরে। দুপুর গড়িয়ে যাবার পর আমোদগঞ্জে এসে শুনল, কিছুক্ষণ আগেও একটা দলকে দেখা গেছে।

একটি মুদী-দোকানে বসে কিছু চিঁড়ে আর জল খেয়ে নিল

কুঁচলাল। আবার বেরলো। বেরিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে, পূবের বাইরের সড়ক ধরবে বলে এগুলো। তার আগেই দাঁড়াতে হল তাকে। বাঁদর।

বাঁদর নয়, বাঁদরী। তিনটে বাঁদরী—তিনটেই মা, তিনটেরই পেটে বাচ্চা ঝুলছে। সারাদিনের ক্ষুব্ধ হতাশা এবার রুদ্র হয়ে উঠল কুঁচলালের। গোসাপ-চোখ যেন শিকারকে নজরবন্ধ করল গাছের ডালে।

মিছে বলবে না কুঁচলাল, ছেলেমেয়েগুলিকে বুকে আগলানো কুসুমের কথাটা তার একবার মনে পড়ল। তবু সে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে বন্দুক তুলল। আর ঠিক সেই সময়ই কয়েকটা লোকেব কথাবার্তার স্বরে, বাঁদরীগুলি এদিকে ফিরতেই উদ্যত শমনকে দেখতে পেল। দেখেই, অন্য গাছে লাফিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই গুলি ছুঁড়ল কুঁচলাল।

কেউ পড়ল কিনা, না দেখেই, গাছের দোলানি কোনদিকে সেটা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি বারুদ গেদে ছুটে গেল। একটা বাঁদরী একটি বটগাছে উঠে পড়েছে, যেখানে অন্য কোনো গাছ কাছে নেই লাফিয়ে পড়ার। নামলে তাই মাটিতেই নামতে হয়। বাঁদরীটা তাই ত্রাহি চিৎকার করে, পেটে বাচ্চা নিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল ডালে ডালে।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুঁচলাল। বাঁদরীটার কোথাও যাবার উপায় নেই। বাচ্চাটা তীক্ষ্ণ গলায় চিঁ চিঁ করছে। লোক জড়ো হয়ে গেছে কুঁচলালকে ঘিরে। সবাই হাসছে, চিৎকার করছে, কলা দেখাচ্ছে বাঁদরীটাকে।

বাঁদরীটা কাঁদছে আর আশেপাশে দেখছে। আর আগের চেয়ে স্থির হয়ে এসেছে। কিন্তু যেদিন খাবার থাকে না, সেদিন কিরকম কাঁদে কুসুম ছেলেমেয়ে নিয়ে, সেটা কুঁচলালের মনে আছে। তাই বাঁদরীর কান্না সে শুনবে না।

কে একজন বলল, নীলপুরে একজন ফাঁদ পেতে বারোখানি বাঁদর মেরেছে।

কুঁচলাল শুনল, নীলপুরের একটা লোক চব্বিশটা টাকা পেয়েছে। সে গুলি ছুঁড়ল। বাঁদরীটার সঙ্গে বাচ্চাটাও পড়ল। সেটা মরল শুধু আছাড় খেয়ে। দুটো ল্যাজই ক্ষুর দিয়ে কাটল সে। ধাড়ি আর বাচ্চার গড়পড়তা দু'টাকাই হিসেব। এর আগের বাঁদরীটাও পড়েছে। ভেগেছে বাচ্চাটা।

লোকেরা বাঁদরকে মারতে চায়। তবু যেন কুঁচলালকে তাদের নিষ্ঠুর বলে মনে হল। তাই খানিকটা যেন ভয় ও ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে রইল সবাই তার দিকে।

কে একজন বলল, আমোদগঞ্জের বাঘমারা জামাই শেষে বাঁদরমারা হল ?

কুঁচলাল শুধু নির্বিকার নয়, নীরবও। কাছেই কুসুমের বাপের বাড়ি। সবাই তার চেনা। কিন্তু সেখানে যাবে না কুঁচলাল। কুসুমের ভাইয়েরা তাকে ভাত খাওয়াতে চাইবে আর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। এদেরই মতো ভাববে, সে কশাই। কেন না কুঁচলালের মনটা তারা বুঝবে না!

উত্তর দিকে এগলো সে। গুলির শব্দে ও ছটকে-যাওয়া বাঁদরীটার কাছে সংবাদ পেয়ে, এতক্ষণে জানোয়ারগুলি এ তল্লাট ছেড়ে সরে পড়েছে।

শেরপুরে এসে যখন পৌঁছল তখন বিকেল হয়েছে। শুনল, আছে। তার চিহ্নও রয়েছে। প্রায় সাতআট বিঘা ছোলা-মটর-মূলো ধ্বংসেছে শেরপুরে। গোটা পঞ্চাশ নাকি দল বেঁধে আছে।

কিন্তু তিনদিন ঘুরেও দলটার সন্ধান করতে পারল না কুঁচলাল। তবু তিন দিনে পাঁচটা ছুটকো বাঁদর মারা পড়েছে।

চার দিনের দিন মনে হল, এ তল্লাটে আর একটা বাঁদরও নেই, যেন এ পৃথিবীতে নেই। চারদিনে দুবার ভাত খেয়েছে কুঁচলাল।

বাদবাকি চিঁড়ে-মুড়িতেই কেটেছে। পুকুর আর ডোবার অভাব হয়নি। জলে নেমে ডুব দেওয়া 'গেছে। কিন্তু তেলহীন রুক্ষ চেহারাটা আরো ভয়ংকর হয়েছে। আজ নিয়ে সে সাতদিন বাড়ীর ভাত খায় নি, বাড়িতে থাকে নি।

সে যেখান দিয়ে যায়, সেখানে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। তার গায়ে পঁচা গন্ধ, ল্যাজের মাংসগুলি পঁচছে তার পুঁটলির মধ্যে।

এখন তাকে দেখলে একটা ভবঘুরে পাগল বলে দিব্যি মনে করা যেত। কিন্তু কাঁধের বন্দুক আর অপলক রক্তাভ চোখ দেখে, সবাই যেন সভয়ে হতবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে।

দিনের হিসেব ভুলে গেছে বুঝি কুঁচলাল। ল্যাজের হিসেব ঠিক আছে। তবু বাতাস যেন একটা অশুভবার্তা নিয়ে তার কানের কাছে গুঞ্জন করে ফেরে, ফাল্গুন পড়ে গেছে, ফাল্গুন পড়ে গেছে। তখন মহকুমা-হাকিমের মুখখানি মনে পড়ে তার। খাস-মালিকের আমলার মুখটা মনে পড়ে তার। খাস-মালিকের আমলার মুখটা মনে পড়ে, যে মুখটাতে কি এক মস্ত ধাঁধা যেন ঝিক্‌ঝিক্ করে। মনে হয় লোকটার ছায়া পড়ে না মাটিতে, আর সেই দূর নাজ্‌নাতে দাঁড়িয়েও তাকে দেখতে পাচ্ছে সব সময়।

মানুষ ভয় পেলে যেমন ভক্তিতে হঠাৎ নমস্কার করে, কুঁচলাল তেমনি হঠাৎ মনে মনে নমস্কার করে বসে সেই মুখটাকে।—হেই দেবতা, হেই দেবতা গো।

আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে যেন বাঁদরের দল পিলপিল করে। চটের বস্তা-বাঁধা একটা মোটা ল্যাজের গাঁটরি সে দেখতে পায় যেন ছোটবাবুর অফিসে।

তারপর আরো পূবে, নীলপুর ছাড়িয়ে, গাদিগড়, কুঁদপাড়া, মেয়াপুরের দিকে যেন কোনো এক অদৃশ্য ইশারায় পা চলে তার। পর পর কয়েকদিন বন্দুকের শব্দে, মরণের বিভীষিকা দেখে, বেশ একটা ভেবেচিন্তে যোগসাজস করেই যেন [illegible]গুলি পালিয়েছে।

কিন্তু আদিগন্ত ফসলের ক্ষেতের এই নিশ্চিত ফাঁদ ছেড়ে যাবে কোথায়? সংসারে এই তো সবচেয়ে বড় ফাঁদ সকলের,—জীবেরা খেতে চায়, বাঁচতে চায়।

কুঁদপাড়ার এক কলাবাগানের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে, দৃশ্যটা দেখতে পেল কুঁচলাল। মিছে বলবে না সে, কুসুমকে বুকে ধরে সোহাগ করবার কথা তার মনে পড়ল। মনে পড়ল, কুসুম রাত জাগে নস্তুখুড়ির পাশে শুয়ে শুয়ে। বাচ্চাগুলি থাকে তার পাশে, পুরুষ ধাড়িটার জন্য মন পোড়ে কুসুমের।

তবু জোড়-খাওয়া জোড়াটার দিকে গুলি ছোঁড়ে কুঁচলাল। আর মুহূর্তে গোটা কলাবাগানটা আন্দোলিত হতে থাকে। বোঝা গেল বড় একটি দল বাগানের মধ্যে ছিল। পালাচ্ছে খোলা মাঠের দিকে। কিন্তু কলাবাগান যেন একটি দুর্ভেদ্য বেড়ার মতো, আরো তিনবার বারুদ গেদে গুলি ছুঁড়ল কুঁচলাল। শেষ পর্যন্ত মারা গেল দুটো।

ফ্যাসাদ করল সে মায়াপুরে এসে। একটি পাকা বাড়ির ছাদের কোণে-বসা বাঁদরকে গুলি করার পরেই ভীষণ একটা হৈ-হৈ পড়ে গেল। দিন দুপুরে ডাকাত ধরার সব লাঠিসোটা নিয়ে সেই বাড়ীর লোকেরা বেরিয়ে এল।

ব্যাপার এমন কিছু নয়। ছাদের নীচেই, জানলার কাছে নাকি একটি মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে ছিল, গুলির শব্দে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

বাঁদরটা মরেছিল ছাদেই। তার ল্যাজ তো পাওয়াই গেল না, এক গুরুতর অপরাধের দণ্ড হিসেবে তাকে গ্রাম থেকেই তাড়িয়ে দিল লোকগুলি। কেননা, বাঁদর মারার অছিলা করে বেড়ানো এরকম অনেক শয়তান নাকি তারা দেখেছে। কেননা, অছিলা করলেও, চেহারাটা তো গোপন নেই।

তা বটে, মিছে বলবে না কুঁচলাল, চেহারাটি তার রাজপুত্তুরের মতো নয়। মেয়াপুরের ভদ্রলোকদের চেহারা রাজপুত্তুরের মতো। কিন্তু সে শয়তান হল কেন?

মেয়াপুরের মাঠে নেমে পিছন ফিরে সে গ্রামটাকে দেখল একবার। জিভটা তার শুকনো লাগছে। সারাদিন কিছু পেটে পড়ে নি তার আজকে। কেমন একটি অসহায় বোবা জীবের মতো খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল মাঠে। ছাদের ওপর পড়ে থাকা বাঁদরটার কথা মনে পড়ল তার। পেলে উনিশটা হত। কিন্তু আর মেয়াপুরে ঢোকা যায় না।

বড় রাস্তার ওপর দিয়ে, শামলা মাথায় একটি লোককে সাইকেলে চেপে যেতে দেখে, চমকে উঠল কুঁচলালের মনটা। ইনি হয়তো ডাক্তারবাবু, কিন্তু মহকুমা হাকিমের মুখখানি মনে পড়ছে তার। আর মনে পড়ছে আমলার মুখখানি—যে-লোকটি শুধু দলিলদস্তাবেজ দেখে টাকা তৈরি করতে পারে।

ফাল্গুনের কদিন আজকে? মনে নেই, একেবারেই স্মরণ হচ্ছে না কুঁচলালের। তার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল যেন। একটা ভয়ংকর দুর্যোগ যেন তার বুকে এসে ধাক্কা মারছে। বন্দুকটা শক্ত হাতে ধরে তাড়াতাড়ি উঠল কুঁচলাল। একুশ মাইল পাক দিয়ে আবার দক্ষিণে-পশ্চিমে পেছতে লাগল সে। উঠবে গিয়ে জুড়নগাঁয়ের বিলের কাছে। মাঝে পড়বে আগনগাছি, নৈরা, ঝিঙেদল, মনসাতলি। রাত্রিটা কাটাতে হবে বোধহয় নৈরাতেই। ইতিমধ্যে সূর্য হেলে গেছে পশ্চিমে।

পা চালিয়ে যাবার যো নেই। নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে, ওত্ পাততে পাততে যেতে হবে তাকে।

আগনগাছি পার হয়ে, নৈরার কোমর-জল যমুনার উঁচু পাড়ের কাছে জঙ্গলের পথে থামতে হল কুঁচলালকে। সতর্ক তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল চারদিকে। কিছু নেই তবু একটা তীক্ষ্ণ খ্যাকানি শুনতে পেয়েছে সে। মানুষের? কিন্তু গন্ধ পাচ্ছে কিসের?

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল কুঁচলালের। আবার একটা তীব্র হুংকার শুনতে পেল সে। তাদেরই হুংকার।

গাছের আড়ালে আড়ালে খানিকটা উত্তরে যেতেই, চোখে পড়ল তার।

উঁচু পাড়ের ওপর প্রায় বারো তেরটি বাঁদরী, সারি সারি বসে আছে নির্বিকার হয়ে। আর তাঁদের সামনেই, দুটি বড় বড় হুলো, পরস্পরের চোখে চোখ রেখে পাক খাচ্ছে আর আক্রমণের ছল খুঁজছে।

যেন দুই বাদশা লড়ছেন, আর বেগমেরা গা চুলকে আরাম করে উকুন চিবোচ্ছেন। যিনি জিতবেন, তাঁর হাত ধরে সব বেগমেরা হারামে গিয়ে উঠবেন। রাজ্য নয়, বাদশারা প্রেমের লড়াই করছেন।

এইভাবেই বাঁদরের বিয়ে হয় আর খাঁটি কুলীনের মতো একাধিক পত্নী নিয়েই তাদের সংসার। শক্ত হাতে বন্দুকটা ধরেও, লড়াইটা দেখতে লাগল কুঁচলাল। বীরভোগ্যা বসুন্ধরার বীরদের এমন লড়াই আর বীর্যশুল্কাদের এমন খাঁটি প্রেম দেখতে (মিছে বলবে না কুঁচলাল) ভালোই লাগল তার।

কিন্তু কোনটাকে মারবে সে? যে জিতবে? না, তাকে নয়, যে হারবে।

কারণ, হেরে যাওয়াটা সবচেয়ে বেশী বদমাইসি করবে, ক্ষতি করবে। কারণ, বন্ধু আর বউ থাকবে না, ওর মেজাজ সবসময় খিঁচড়ে থাকবে, ক্ষেপে থাকবে।

লড়াই নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে চলেছে, কারণ দুইজনেরই চোখে-মুখে গায়ে রক্তের দাগ। গায়ের জায়গায় জায়গায় লোম উপড়ে ফেলা হয়েছে।

হঠাৎ দু'টিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝুটোপুটি লাগল। বন্দুক তুলে ধরল কুঁচলাল। কিন্তু ওরা আবার ফারাক হয়ে পাক দিতে লাগল।

কুঁচলাল গুণল। তেরটা বাঁদরী দুটো মদ্দা। তিরিশটা টাকা তার চোখের ওপর। কিন্তু একটাকেও মারতে পারবে না হয় তো কুঁচলাল, থোক্ তিরিশ টাকা তো অনেক, অনেক দূর।

আবার ঝুটোপুটি লাগল, আর তীক্ষ্ণ চিৎকারে আকাশটা যেন ফেটে গেল। ট্রিগারে হাত দিল কুঁচলাল আর মুহূর্তে মতের পরিবর্তন হল তার। সে দেখল, একটা হুলোর বুকের চামড়া চিরে দিয়েছে, লাল মাংস দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তখনো ছাড়ান পায় নি। ওটা মরবেই। জিতে যাওয়াটাকেই তাগ্ করল সে। গুলি ছুঁড়ল।

দিশেহারা বাঁদরীগুলি পাড়ের দিকে নেমে প্রথম নদীর দিকে গেল। ক্ষিপ্রবেগে বারুদ আর গুলি গেদে প্রায় পাগলের মতো জলের দিকে ছুটে গেল কুঁচলাল। গুলি ছুঁড়ল।

জলের কাছে গিয়ে ওরা ছত্রভঙ্গ হল। কুঁচলাল পিছন ছাড়লনা। ছুটতে ছুটতে আরো তিনবার গুলি করল। তখন সে প্রায় আধ-মাইল দূরে চলে এসেছে।

পথের থেকে দু'টিকে ল্যাজ ধরে টানতে টানতে ছুটে এল আবার সেখানো। জলের ধারে একটা বাঁদরী, আর পাড়ের ওপর দুটো মদ্দা।

ল্যাজগুলি কেটে, মাথায় পুঁটলি আর বন্দুক নিয়ে কোমরজল যমুনা পার হল কুঁচলাল! নৈরাতে রাতটা কাটল একজনের বাড়িতে। দুটি ভাত পেল খেতে। কিন্তু ভাতগুলি বমি হয়ে যাবার দাখিল। ফাল্গুন মাসের নাকি সাতদিন আজ? ভোর-ভোর উঠে জুড়নগাঁয়ের দিকে চল্‌ল সে।

কিন্তু টিপে টিপে ঝিঙেদল আসতেই দুপুর হয়ে গেল। কিছু পাওয়া গেল না।

কিন্তু শীত লাগছে কেন কুঁচলালের? গায়ে হাত দিয়ে সে বুঝতে পারে না। তবে বাতাস হঠাৎ বেড়েছে। লোকে বলে, এটা 'সমুদ্দুরের বাতাস' শুকনো মিঠে বাতাস, তাপ আছে বেশ। কদিনের মধ্যেই সমস্ত মাঠগুলি যেন পাঁশুটে রঙ ধরে গেছে। কুঁচলালের পাঁচ বিঘেও পেকেছে নিশ্চয়। মন বড় আন্‌চান্ করে। নাজ্‌নায় যাবে কুঁচলাল, নাজ্‌নায় যাবে।

কিন্তু বাতাসটা গায়ে লাগলে এমন হয় কেন? শীত নয়, কেমন যেন ভয়-ধরা কাঁটা-লাগা ভাব।

বাতাসটা যেন একটা পাগলা ঠাকুরের মতো, কিসের ভয় দেখায় কুঁচলালকে।

মনসাতলিতে এসে তিনটিকে মেরে, জুড়নগাঁয়ে আসতে রাত হল তার।

সকালে তার ঘুম ভাঙল লোকের চেঁচামেচিতে। যার বাড়িতে শুয়েছিল সে চেঁচিয়ে ডাকল, অই গো বন্দুকয়ালা, এস, তাড়াতাড়ি এস, ক্ষেতে বাঁদর পড়েছে।

পুঁটলি আর বন্দুক নিয়ে লাফিয়ে উঠল কুঁচলাল। জিজ্ঞেস করল, কোন্ মাঠে?

—পূবের মাঠে।

বেরিয়ে এসেই আগে মাঠের দিকে গেল। তারপর চিৎকার করে বলল সবাইকে, গোল হয়ে ঘেরো। ঘিরে, জোড়াপুকুরের দিকে তাড়া দাও।

সারা গ্রামের জোয়ানরাই প্রায় লাঠিসোটা নিয়ে প্রস্তুত। এক-দলকে নিয়ে, জোড়াপুকুরের দুই ধারে ছড়িয়ে দিল কুঁচলাল। পাগলের মতো চিৎকার করে বলল, খবরদার, এক শালাও যেন পালাতে না পারে। ওরা পাছ্ দিয়ে আসছে, তোমরা দুপাশে, আমি একলা এখানে।

তার চিৎকারে সবাই যেন তটস্থ। যেন সৈনিকদের হুকুম করছে সেনাপতি।

আর ব্যাপারটা ঘটলও তাই। লুভিষ্টির দল তিন দিক থেকে ঘেরাও হয়েছে! যদিও কাছেপিঠে গাছগুলিই একমাত্র পালাবার রাস্তা তবে সেগুলি ছাড়া ছাড়া।

পিছনের তাড়া খেয়ে বাঁদরগুলি সামনে আসতেই পুকুর পড়ল, আর, দুদিকে সবাই চিৎকার করতে লাগল।

কুঁচলাল চিৎকার করতে লাগল, যাতে জানোয়ারগুলি দিশেহারা হয়ে পড়ে। আর যন্ত্রের গতিতে বারুদ গেদে, এক-একটা গুলি ছুড়তে লাগল।

পিছনের লোকগুলি পুকুরের ওপারে না এসে পড়া পর্যন্ত নিশ্চিন্তে গুলি চালিয়েছে কুঁচলাল। এবার তাকে সাবধান হতে হল।

কিন্তু গুলির ভয়ে পিছনদিকের সবাই সরে পড়তে লাগল। কুঁচলাল চিৎকার করে উঠল, খবরদার, মাঠের পথ ছেড় না।

পিছনের লোকেরা আবার ঘিরল, কিন্তু প্রত্যেকটি গুলির শব্দে ছত্রভঙ্গ হতে লাগল তারা। সেই ফাঁকেই জানোয়ারগুলি মরিয়া হয়ে পালাতে লাগল।

শেষে সব স্তব্ধ হল। তখন গোটা গ্রামটা ভেঙে পড়েছে জোড়াপুকুরের ধারে। শত্রুর মরণোৎসব দেখছে সবাই।

কুঁচলাল ক্ষিপ্র হাতে ল্যাজ কাটতে লাগল। এক, দুই, তিন··· বারো। বারোটা। দুই হাত তার রক্তাক্ত। পুঁটলি তার ভরতি কিন্তু অনেক বাকি!

তবু আগে যেতে হবে ছোটবাবুর কাছে। জমা দিতে হবে উনচল্লিশটা ল্যাজ! টাকা নিতে হবে, আমলার কাছে যেতে হবে। টাকা দিয়ে, টাকার সময় নিতে হবে, হাতে-পায়ে ধরতে হবে।

কিন্তু মিছে বলবে না কুঁচলাল, মানুষ দেখে তার বড় অবাক লাগে। সবাই তার দিকে এমন করে তাকিয়ে আছে, যেন সে একটা খুনী। যেন সে একটা সর্বনেশে ভয়ংকর।

তাড়াতাড়ি পথ ধরল সে উত্তর-পশ্চিম কোণ নিয়ে। রন্দাগাঁয়ের হাটের ধারে, ছোটবাবুর দপ্তরে যাবে সে। কিন্তু সবাই হেসে, চিৎকার করে, বিদ্রূপ করতে লাগল তাকে।

করুক। মুখ খুলবে না কুঁচলাল। সে একটা পাখি, ঠোঁটে তার খাবার। মুখ খুললেই যেন পড়ে যাবে।

দূর থেকে নাজ্‌নাকে দেখতে পেল সে। নাজ্‌নার মাঠের ওপর দিয়েই তার পথ। নাজনার দিক থেকে কারা যেন আসছে এদিকে। হাত তুলছে, ডাকছে বোধহয় কাউকে।

কুঁচলালকেই! ছুটতে ছুটতে সে তার কাছে এল, সে গাঁয়ের বুড়ো ভবখুড়ো।

ভবখুড়োর গলায় ত্রাস, কিন্তু বড় রাগ, বলল, এই আরে এই বদ, শোন্‌।

কুঁচলাল দাঁড়াল না। মিছে বলবে না, এসময়ে ভবখুড়োর গাল তার ভালো লাগছে না। মন্দ কিছু করে থাকলে পরে বলতে পারে। কুঁচলাল বলল, সময় নাই ভবখুড়ো, পরে শুনবখনি।

ভবখুড়ো এবার চেঁচিয়ে উঠল, থামরে ম্যাড়া, থাম্‌, কোটের নুটিশ এয়েছে, প্যায়দা এয়েছে, আমলা এয়েছে।

খতিয়ে গিয়ে, ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল কুঁচলাল, কিন্তন্‌ শুন্‌তি পোরে নাই যে?

পরমুহূর্তেই যেন চমকে উঠে বলল; তারা এসে পড়েছে? কি বলছে তারা?

ভবখুড়ো ঢোক গিলে বলল, সেটা গিয়ে দেখবি চল।

ভবখুড়োর মুখ দেখে, বাতাসটা যেন জোরে ধাক্কা দিল তার গায়ে। কাঁটা দিল যেন। চোখে তার পলক পড়ল একবারের জন্য। ভবখুড়োর পিছন ধরল সে।

তার পাঁচ বিঘার কাছে এসে, আর একবার পলক পড়ল তার। তারপরে, অপলক চোখ দুটিতে, ভয়ংকর আক্রোশের আগুন উঠল দপদপিয়ে! বন্দুকের উপর থাবাটা শক্ত হয়ে উঠল। দেখল, জমিতে তার নীলামী নিশান উড়ছে, ট্যাং ট্যাং করে ঢাক বাজছে, আমলা আর কোর্টের পেয়াদা খাড়া। চারটে অচেনা লোক তার কড়াইশুটি উপড়াচ্ছে, আলু তুলছে।

ছেলেমেয়েগুলি কোথেকে এসে কোমর জড়িয়ে ধরল তার। এই

দুঃসময়ে বাপের জন্য হাহাকার করছিল ওদের প্রাণগুলি। ঘোমটা টেনে তার কুসুমটি এসেছে, পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কুঁচলাল দেখতে পেল না। সে যেন বন্দুক-ধরা হাতটাকে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, পারছে না। একটা পঁচা দুর্গন্ধ তার গা থেকে সারা জায়গাটায় ছড়িয়ে পড়েছে।

কুসুম গায়ে হাত দিয়ে বলল, অগো, এই, অমন করে কি দেখছ? কুঁচলাল বলল, 'বাঁদর'।

কুসুম চমকে বলল, অঁ্যা?

হ্যাঁ, মিছে বলবে না কুঁচলাল, সে দেখছে বাঁদরে তার ফসল খাচ্ছে, তছনছ করছে। কিন্তু বাঁদরগুলির লুটিশ আছে, ট্যাটুরা আছে, আইন আছে।

কুসুম দুহাত দিয়ে কুঁচলালের হাত ধরে টান দিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ডাকল, অই গো, অমন করছ কেন?

কুঁচলালের গলার শিরাগুলি যেন ছিঁড়ে গেল। আর গোসাপের মতো অপলক চোখ দুটিতে অকুলের বান। ভাঙা ভাঙা দাঁত-পেষা গলায় বলল, বাঁদর দেখে লো বউ। কিন্তন বাঁদরগুলানরে মারবার আইন নাই।

কঠিনপ্রাণ কুঁচলালের চোখে জল দেখে কুসুমের 'হায়া' গেল। লোকজনের সামনে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, হেই গো ভগমান, তুমি কেমন কর?

—কিছু না বউ, ছোটবাবুর কাছে যাই। কামটা পাকা করতে হবে।

দেওয়াল লিপি

যেখানে লেখাটা ছিল দেওয়ালের গায়ে, সেখানে হঠাৎ ব্রেক কষল জীপ গাড়িটা।

ঘটনা খুব সামান্য। কারো নজরেই ছিল না ব্যাপারটা। কিন্তু ছোট মফস্বল শহর। সামান্য ঘটনা-ই অসামান্য হয়ে উঠল। ছোট হলেও জমজমাটি শহর। দু-একটি কলকারখানা আছে। বাজারটি বেশ বড় বাজার। রেল লাইনের ওপারের গ্রামের চাষীবাসীদেরও ভিড় হয়। মিউনিসিপ্যালিটি আছে, থানা আছে। ছেলে আর মেয়েদের হাইস্কুল আছে কয়েকটি। কলেজ হবে একটি, শোনা যাচ্ছে।

স্বজনে কিছু নির্জনতা। ব্যস্ততার মধ্যেও মন্থরতা। যাকে বলা যায়, মফস্বলের একটু ঢিলে-ঢালা ভাব।

সেদিন তখন প্রায় বেলা দশটা। জীপ গাড়ীটা হঠাৎ ব্রেক কষল সেখানে, যেখানে পেট্রল পাম্পের পাঁচিলটা এসে পড়েছে রাস্তার কাছে অনেকখানি। আর পাঁচিলটার ধার দিয়ে চলে গেছে একটা গলি। গলির মোড়েতেই জীপটা দাঁড়িয়েছে। কানা গলি—এঁকে বেঁকে খানিকটা গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। খান তিনেক দোতলা, গুটিছয়েক একতলা, আর কতগুলি খড়ো ঘর গলিটাতে। নাম, ঠাকুর গলি। আসলে বেশ্যাপল্লী। এই ঠাকুর গলিটিকে আড়াল দেওয়ার জন্যই যেন পেট্রোল পাম্পের দেওয়ালটা বেড়ে এসেছে অনেকখানি। সেই দেওয়ালটার সামনে ব্রেক কষল পুলিশ অফিসারের জীপ। থানার নতুন অফিসার-ইন্-চার্জ। মাসখানেক এসেছেন পূবদিক থেকে বদলী হয়ে। বয়স অল্প, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে।

কিন্তু এর মধ্যেই খুব কড়া লোক বলে খ্যাতি হয়ে গেছে। এদিকে আবার রীতিমতো সোশ্যাল।

জনসভায় বক্তৃতা দেন না বটে। কিন্তু সাতচল্লিশোত্তর দেশের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সবসময় সচেতন করেন লোককে। এমন কি, ঠেলাগাড়িওয়ালা রংসাইড দিয়ে গেলে, তাকে নিজের হাতে সাইড্ চিনিয়ে দিয়ে বলেন, কতদিন আর তোমরা এভাবে চালাবে? এখন থেকে তোমাদের এসব বুঝতে হবে। ঠিক রাস্তা পাকড়াও।

পৌরকর্তৃপক্ষের কাছে পর্যন্ত তাঁর আনাগোনা। শহরটা যেন নীট অ্যাণ্ড ক্লীন্ থাকে। অবশ্যই অনুরোধ, কিন্তু তাড়া দেন রীতিমতো। চোর আর গাঁটকাটাদের মধ্যে সাড়া পড়েছে।

অফিসার বলেন, 'আমার এলাকা শান্তিপূর্ণ আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চাই। রুচিবান ভদ্রলোক ছাড়া কারো আশ্রয় হবে না এখানে। যার ভালো না লাগে, সে চলে যেতে পারে।'

এখানে আসার দু-দিন পরেই সেপাইদের নিয়ে বেরিয়েছিলেন। যত দোকানের সামনে ছিল বেঞ্চ পাতা, সব সরিয়ে দিয়েছিলেন। দোকান থেকে খানিকটা বাড়িয়ে হয়তো কেউ রাস্তার উপর চটের থলি টাঙিয়েছে রোদের জন্যে। দেখায় ভারি বিশ্রী আর বে-আইনী। রোদ লাগে, দোকান বন্ধ করে রাখুন। তা বলে রাস্তার দেড় হাত জায়গা আপনি আটকে রাখতে পারেন না।

খুব উৎসাহী মানুষ। ব্যস্ত দ্রুত অথচ রাশভারী। নিজেই জীপ চালিয়ে শহর ঘোরেন একবার রোজ।

কিন্তু ঠাকুর গলির মোড়ে কেন? আশেপাশে অনেক দোকানপাট। অদূরেই বাজার। সকলেই বিস্মিত দুশ্চিন্তায় ফিরে তাকাল। কী হল আবার! যে যার নিজের দোকানের চারপাশ দেখে নিল একবার।

ঠাকুরগলি-বাসিনীরা কেউ কেউ বসেছিল দরজার কাছে, দাঁড়িয়েছিল দরজার আশেপাশে। কেউ বাসী চুল এলিয়ে, কেউ

রাতজাগা চোখ মেলে। সচকিত হয়ে উঠল ওরা। ওমা। ওমা। দারোগা কেন গলির মোড়ে?

অদূরে টহল দিচ্ছিল একটি কনেস্টবল সে এল ছুটে। এসে অফিসারের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল দেওয়ালের দিকে।

অফিসার বললেন, 'যতসব রাস্‌কেলের কাণ্ডকারখানা। ডাক তো ওই দোকানদারটাকে।'

কোন দোকানদার, না দেখেই সেপাই চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, এদিকে এস।'

কাকে ডাকল, কেউ বুঝল না। সামনে ছিল হরি পানওয়ালা। সে ছুটে এল কাছে।

অফিসার দেওয়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'দেওয়ালে কে লিখেছে এটা?'

হরি উড়িষ্যাবাসী। বাংলা লেখা বোঝে না। লোকটি ভালো। কথা বলে একটু নেকিয়ে-নেকিয়ে। বলল, 'আমি তো জানি না বাবু।'

অফিসার বললেন ভ্রূ কুঁচকে, 'জান না তো, দোকানটা রয়েছে কি করতে? কদ্দিনের দোকান?'

'আজ্ঞে, তা বছর দশেকের হবে। আমি তখন—'

'থাক। দশ বছর ধরে এইখানে দোকান করছ আর লেখাটা কদ্দিন থেকে দেখছ?'

এবার একটু ঘাবড়ে গেল হরি। ইতিমধ্যে আশেপাশের দোকানের থেকেও কয়েকজন এসেছে সন্ত্রস্ত মুরগীর মতো পা ফেলে-ফেলে। আর ঠাকুরগলির মেয়েরা আধাসন্ত্রস্ত মুখে দেখছে উঁকি মেরে।

স্টেশনারী দোকানদার কানাই বিশ্বাস। পোশাকে একটু ফিটফাট। বলল, 'স্যার, এই লেখাটা প্রায় এক বছর ধরে আছে।'

'এক বছর!' বিস্ময় চাপা গলা অফিসারের। বললেন, 'আর এক বছর ধরে শহরের এই বড় রাস্তায় এই লেখাটা আপনারা দেখছেন, তবু ব্যবস্থা করেননি? বাঃ, খুব ভালো কাজ করেছেন।'

ধমক খেয়ে, সকলের মুখগুলি কেমন বোকা বোকা দেখাতে লাগল। সত্যি, চোখে হয়তো পড়েছে, কিন্তু কারো কিছু মনে হয়নি তো। মনে হবে কি! খেয়ালও নেই কারো। শহরের নানান কিছুর মধ্যে দেওয়ালের এই লেখাটাও মিশেছিল।

আজ, এই মুহূর্তে টনক নড়ে উঠল সকলের। সত্যি, কি বিশ্রী! প্রায় এক ফুট লম্বা-লম্বা অক্ষরে কথাগুলি পাঁশুটে রঙ দিয়ে লেখা রয়েছে কিংবা তার চেয়েও বড় কাঁচা হাতে লেখা রয়েছে :

'যে এই গলিতে ঢোকে, সে শুয়োরের বাচ্চা।'

নিশ্চয়ই কোন বখাটে বদমাইসের কাজ।

অফিসার যত দেখতে লাগলেন, ততই চটে উঠলেন। সবাইকে বললেন, 'কেউ জানেন. কে লিখেছে ?'

সকলেই চুপচাপ। কেউ জানে না। অফিসার ঠোঁঠ বেঁকিয়ে বললেন, 'কেউ জানেন না। শুধু এত বড় জঘন্য লেখা এক বছর থেকে দেখছেন। ছি-ছি-ছি। একি আপনাদের দেশ নয়, আপনাদের শহর নয়।'

সকলেই অপ্রস্তুত, অথচ ছি-ছি ভাবটা ফুটে উঠেছে মুখে। সত্যি একেবারে বড় রাস্তার ধারে এত বড়-বড় অক্ষরে এমন জঘন্য কথা লেখা রয়েছে। 'ইন্‌ডিসেণ্ট!' অফিসার বললেন, 'মুছে ফেলুন, মুছে ফেলুন তাড়াতাড়ি। এ শহরে এসব চলবে না। আমি চাই ডিসেন্সি, নীট অ্যাণ্ড ক্লীন। এখন আর সেদিন নাই।'

নিশ্চয়ই। হরি-ই ছুটল তাড়াতাড়ি। জল নিয়ে এল এক বালতি। আর একজন, একটি ন্যাকড়া দিয়ে ধুয়ে তুলতে গেল। উঠল না। কে একজন কনস্টেবলের হাতে একটি লোহার বাটালি এগিয়ে দিল। কনস্টেবল চেঁছে-চেঁছে তুলল।

যতক্ষণ না উঠল, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন অফিসার। তারপর জীপে উঠে আবার দেখলেন। পরিষ্কার হয়ে গেছে দেওয়ালটি। নাইস্।

জীপ্‌ ছুটিয়ে দিলেন।

তারপরেও জটলা চলল কিছুক্ষণ। সেই কিছুক্ষণ অফিসারের প্রতিনিধিত্ব করল কনস্টেবল।

ব্যাপারটা মিটে যেত এখানেই। কিন্তু দিন কয়েক পরে, আবার অফিসারের জীপ দাঁড়াল সেই দেওয়ালটার কাছে। আশ্চর্য! আবার তেমনি লেখা রয়েছে তেমনি বড়-বড়, আলকাত্‌রা দিয়ে, একই কথা:

'যে এই গলিতে ঢোকে, সে শুয়োরের বাচ্চা।'

নিচে আবার খড়ি দিয়ে আঁকাবাঁকা ছোট অক্ষরে লেখা, 'ঢুকেছ তো মরেছ।'

অফিসার আঙুল তুলে, গলা চড়িশে ডাকলেন,'এই, এদিকে এস।'

হরি ভাবল, তাকেই ডেকেছে, সে তাড়াতাড়ি ছুটে এল। অফিসারের ফরসা মুখটি লাল হয়ে উঠেছে। জিগগেস করলেন, 'আবার কে লিখেছে এটা।'

হরি অবাক বোকা চোখে, করুণভাবে বলল, 'আজ্ঞে জানি না তো?'

অফিসার ধমকে উঠলেন, 'তোমার দোকানের সামনে, তুমি জানো না কেন? কবে লেখা হয়েছে?'

হরি বলল, 'তাও দেখিনি বাবু। রাত্রিবেলা তো—'

'থাক।'

আজও এসেছে সকলে। কানাই বিশ্বাস বলল, 'স্যার, পরশু সকাল থেকে লেখাটা দেখছি।'

অফিসার বোঁ করে পাক খেয়ে ফিরলেন কানাইয়ের দিকে। তীব্র গলায় বললেন, 'তবে আর কি, আমার মাথা কিনেছেন। কিন্তু কে লিখেছে, তা জানেন?'

'না স্যার।'

'কেন জানেন না? সামনে বসে দোকান করেন, কে এইসব জঘন্য ব্যাপারটা করছে তা জানেন না, কেন? আপনাদের জানতে

হবে। শহরের বুকে এ-রকম একটা ন্যুইসেন্স লেখা কার লিখতে সাহস হয়। পরশু থেকে দেখছেন, অথচ বহাল তবিয়তে আছেন? ছি-ছি, একটা কলঙ্ক! দেখলেও তো লজ্জা করে।'

সকলেরই মুখগুলি কেমন বোকা-বোকা করুণ হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে চাপা-চাপা একটা রাগ। রাগটা অবশ্য ওই লেখকের প্রতি। কিন্তু সত্যি, কেউ জানে না, দেখেনি। এমনকি, আবার লেখাটা দেখেও উড়িয়ে দিয়েছে। যেন ও-রকম জায়গায় এ তো হবেই।

অফিসার বললেন, 'মান্যগণ্য কোনো লোক আপনাদের শহরে এলে, কি বলবে বলুন তো। না-না, এসব চলবে না। আমি আপনাদের উপরই ভার দিয়ে যাচ্ছি, লক্ষ্য রাখবেন, কে এ-সব ন্যুইসেন্স কারবার করে। অ্যাবসার্ড! নইলে শেষ পর্যন্ত আপনাদের বিরুদ্ধেই আমাকে চার্জ ফরম্ করতে হবে।'

ঠাকুরগলির মেয়েরা তো অস্থির। অফিসার এদিকে ফিরে তাকাতেই তারা পড়িমড়ি করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। ইতিমধ্যে বাজারের দিক থেকে ছুটে এসেছে একজন সেপাই। তাকে ধমকালেন অফিসার, 'কোথায় থাক? দেখতে পার না, কে এ-সব লেখে? আজকে আমি ডিউটি প্রোগ্রাম চেঞ্জ করে দেব। এখানে চব্বিশ ঘণ্টা পাহাড়া থাকবে। মুছে ফেল তাড়াতাড়ি।'

অমনি একজন মুদী এক বোতল কেরোসিন তেল আর ন্যাকড়া বাড়িয়ে দিল। আলকাতরার লেখা, ও ছাড়া তোলা যাবে না।

কেরোসিন তেলেই কি যায়! শেষে লোহার বাটালি দিয়েই চাঁছতে হল।

অফিসার জীপটা স্টার্ট দিতে দিতে বললেন, 'যত সব শয়তান জুটেছে শহরে।' হাওয়ার আগে চলে গেল জীপ। তারপর গুলতানি, আজকের জটলাটা একটু বেশিই হল। সেপাইটি মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'শালা, মরলাম আমরাই।'

কে একজন বলল, 'আপনাদের কি! যত দোষ আমাদের।'

তর্কাতর্কি, রাগারাগি এবং আলোচনা চলল খানিকক্ষণ! ব্যাপারটা অন্যান্য পাড়াতেও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল এবং টনক নড়ে উঠল প্রায় সারা শহরটারই।

কিন্তু, যারা গলিটায় ঢোকে, তারা লেখাটা আছে কি নেই, কোনো দিন চেয়েও দেখেনি। আজও দেখল না।

সময়টা যাচ্ছিল শীতকাল। পাহারাওয়ালারা খুবই বিরক্ত। যতক্ষণ দোকান-পাট খোলা থাকে, ততক্ষণ দোকানে বসেই পাহারা দেয়। তারপর রাত্রে ঠাকুর গলির বারান্দায় ওঠে, একটু গল্প-শল্প করে আড্ডা দেয়। কিন্তু নজরটা রাখে।

দোকানদারেরাও নজর রাখছিল। সত্যি গায়ে লেগেছে তাদের। তারপর দোকানগুলিই যদি উঠিয়ে দেয়।

কিন্তু, কিমাশ্চর্যম! দিন পনের পর, শীতের সকালে, সুন্দর ঝকমকে রোদে আবার দেখা গেল সেই লেখা। দরজায় লাগাবার নীল রঙ দিয়ে, সেই একই লেখা, যে এই গলিতে ঢোকে...'

নীচে আবার খড়ি দিয়ে ছোট করে লেখা, 'মাথা খাও, যেও না।'

আর পড় তো পড়, একেবারে অফিসারেরই চোখে। কাছাকাছি একজন সেপাইও ছিল না।

অফিসার রেগে অস্থির হয়ে উঠলেন। আশেপাশের অধিবাসী, দোকানদার, সবাই এল। অফিসার বললেন, 'আমি প্রত্যেককে এজন্য জরিমানা করে ছেড়ে দেব। কে লোকটা আপনাদের চোখের সামনে, আপনাদের মুখের উপর কলঙ্ক লেপে দিচ্ছে, আপনারা জানেন না।'

কে একজন বলল, 'কিন্তু আমরা কি করব স্যার।'

'দ্যাট আই ডোণ্ট নো। এখনো লেখাটা কাঁচা, কালকে রাত্রের লেখা! কেন আপনারা জানেন না। এখানকার দোকানপাট সব উঠিয়ে ছেড়ে দেব।'

আর ঠিক এই সময়েই, পাহারাদার সেপাইটি কোত্থেকে ছুটে এল।

অফিসার প্রায় মারমুখো হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার উপর, 'কোথায় ছিলে। কার ডিউটি ছিল কাল রাত্রে?'

'আজ্ঞে স্যার, বিনয় দাসের।'

'বিনয় দাসের? আচ্ছা, তাকে আমি দেখে নিচ্ছি।'

'বিনয়ের ডিউটি স্যার রাত্রি দুটো অবধি ছিল। তারপর ছিল নরেনের। কিন্তু সে সীক্।'

'কিসের সীক্! কে সই করেছে তার সীকলিভের কাগজ?'

'না, স্যার, হঠাৎ তার বাহ্য-বমি...'

'ছ্যাট আই ডোণ্ট্ নো। যা তা জঘন্য কথা শহরে লেখা থাকবে, আর তোমরা ডিউটিও দিতে থাকবে, চলবে না। চলবে না আর এসব; সেদিন নেই এখন আর। দেশের একটা ইজ্জৎ আছে। মোছ, মুছে ফেল তাড়াতাড়ি।'

আবার মোছামুছি। আবার জটলা। বড় রকমের জটলা। কে একজন বলে উঠল, 'যে লিখছে, তার খুব বুকের পাটা বলতে হবে।

পাহারার আরো কড়াকড়ি হল। এমন কি, একটা ডিফেন্স পার্টিরও তোড়জোড় চলতে লাগল।

এদিকে বিদ্বান বুদ্ধিমান শহরের ভদ্রলোকেরাও নিশ্চুপ রইলেন না। তাঁদের সঙ্গে কিছু-কিছু যুবক এবং মহিলাও যোগ দিলেন। কি করা যায়।

এক রবিবারে তাঁরা সবাই দেখা করলেন থানার অফিসারের সঙ্গে।

ব্যাপারটা নিয়ে, তাঁরাও ভাবছেন। অফিসার সবাইকেই চেনেন। স্কুল-মাস্টার, উকিল, ডাক্তার, দোকানদার, সবাই আছেন এঁদের মধ্যে। দুজন স্কুল মিসট্রেস্, একজন লেডী ডাক্তারও আছেন।

অফিসার বললেন, 'কি ব্যাপার, আপনারা?'

মনোহরবাবু স্কুলমাস্টার, সদাশয় ব্যক্তি। বললেন, 'আমরা

আপনার কাছে একটা দরখাস্ত নিয়ে এসেছি। ওই ব্যাপারটা, বুঝলেন? ওই যে সেই, গলির মোড়ে…'

'ওঃ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো, খুব ভালো। নিশ্চয়ই, আপনারা ভাববেন বৈকি! আপনারা একটু আমার ঘরে বসুন, আমি আসছি।'

আগে অফিসার-ইন্-চার্জের কোনো আলাদা ঘর ছিল না। এখন বেশ বড় ঘর হয়েছে। কিন্তু সকলের বসবার জায়গা হল না। মহিলারা আর বয়স্করা কেউ-কেউ বসলেন।

অফিসার এলেন। বললেন, 'কি ব্যাপার বলুন।'

মনোহরবাবু বললেন, 'আমরা আপনার কাছে একটি গণ-দরখাস্ত নিয়ে এসেছি। ওই ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি…'

'নিশ্চয়ই! খুব ভালো কথা। দিন দরখাস্ত।'

মনোহরবাবুরা তৈরি হয়ে এসেছেন অন্যভাবে। বললেন, 'আপনার হাতে কি সময় আছে?

'কতক্ষণ, বলুন? ঘণ্টাখানেক?'

'হ্যাঁ, তা-ই। আলোচনা মুখে না করে, আমরা বাংলা দরখাস্তটা আপনাকে পড়িয়ে শোনাতে চাই।'

অফিসার বললেন, 'বেশ পড়ুন।'

মনোহরবাবু ইশারা করলেন একটি ছেলেকে। সে সামনে আসতে বললেন, 'তুমি পড়ো, ভালো করে পড়বে।'

ছেলেটি পড়তে লাগল :

শ্রীযুক্ত অফিসার-ইন্-চার্জ, অমুক থানা, অমুক জেলা মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়, আমরা এই শহরের ভদ্রলোক বাসিন্দা। কিছুদিন যাবৎ শহরে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিতেছে। এই ব্যাপারে আমরা যথার্থ মর্মাহত, আপনিও ব্যথিত। তাই, আমরা আর নীরব থাকিতে পারিলাম না।

আপনি জানেন, ইতিহাসও সাক্ষ্য দিতেছে, নারীদেহ ব্যবসা

পৃথিবীতে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। বর্তমান সভ্য-সমাজেও এই পাপ-ব্যবসা বিষাক্ত ক্ষতের মতো...ইত্যাদি।

সকলেই খুব চমৎকৃত। অনুসন্ধিৎসু মুগ্ধ চোখে দেখছেন অফিসারকে। অফিসার গালে হাত দিয়ে, গম্ভীর মুখে, টেবিলের দিকে চেয়ে রয়েছেন।

ছেলেটি পড়তে লাগল :

আমাদের শহরের ব্যাপার দেখিয়া আমরা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা এই শহরের স্বাধীন নাগরিকরাই, এই দেশে প্রথম দাবি করিতেছি, এই পাপ-ব্যবসার বিলোপ সাধন করিয়া, দেহ-ব্যবসায়ী নারীগণকে সমাজের মঙ্গলময় কাজে লাগানো হউক।

যদি বিলোপ সাধন এখুনি সম্ভব না হয়, তবে ঠাকুর গলির ব্যবসা এই শহর হইতে অন্যত্র উঠাইয়া লওয়া হউক। অন্যথায়, শহরের বুকে, দেওয়ালের কলঙ্ক দূর হইবে না। ইতি—

সকলে উজ্জ্বল চোখে তাকালেন। সেই মুহূর্তেই অফিসার প্রায় ধমকে উঠলেন, 'এসবের মানে কী?'

সকলেই একটু অবাক হলেন। অফিসার বললেন, 'তা হলে আপনারাই দেওয়ালে লিখছেন?'

রুদ্ধশ্বাস ভীত সকলে। মহিলা তিনজন ঘামছেন। যেন থানার চারপাশ থেকে কাঁটাতারের বেড়াঘিরে আসছে। 'আজ্ঞে? কী বলছেন?'

অফিসারের তীক্ষ্ণ চোখ, তীব্র গলা। বললেন, 'নইলে, এসব কথা লেখবার মানে কী? এইসব, এই পাপ ব্যবসার বিলোপ-টিলোপ ·· তারপরে ঠাকুর গলির ব্যবসা অন্যত্র রিমুভ করা, এসব লেখার উদ্দেশ্য কী আপনাদের?'

একমাত্র মনোহরবাবুর গলাতেই তখনো স্বর ছিল। ঢোঁক গিলে বললেন, 'আজ্ঞে, আমরা বলছিলাম, পাপের মূল না দূর হলে—'

অফিসার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'ওসব পাপের মূলটুল জানি না।

আমি তার কী করব? ওসব বিলোপ সাধন-টাধনের হুকুম নেই আমার উপর। ঠাকুর গলি ইজ্ ঠাকুর গলি। কিন্তু বাইরে কোনো কিছু ন্যুইসেন্স, ভালগারিটি করতে পারবে না। আমি সেসব ধুয়ে মুছে ফেলে দেব, কোনো চিহ্ন রাখতে দেব না, যা আমার কাজ।'

সকলেই চুপ। ভ্যাবাচাকা খাওয়া করুণ চোখের চাওয়াচাওয়ি শুধু।

অফিসার উত্তেজিত থমথমে মুখ। গলার শিরাগুলি ফুলে উঠেছে। তখনো বলে চলেছেন: 'আমি দশজন পুলিস দিতে পারি, বিশজন পারি, আর্মড পুলিস দিতে পারি পাহারা দিতে। ওসব বিলোপ কে করতে পারে, আমি জানি না। রিমুভ করার কোনো অর্ডার নেই আমার উপর। ওনলি নীট অ্যাণ্ড ক্লীন ··'

বলতে-বলতে গলাটা চেপে এল অফিসারের। বললেন, 'দরখাস্ত নিয়ে যান।'

সবাই গুটি-গুটি বেরিয়ে গেলেন। থানার বেড়ার বাইরে এসে তাঁদের সকলের গায়ে যেন একটি মুক্তির তরঙ্গ খেলে গেল। সবাই আটকানো দমগুলিকে হুস্ হুস্ করে ছাড়তে লাগলেন ভেতর থেকে। আঃ, কী সুন্দর হাওয়া! কী সুন্দর রোদ!

আবার একদিন লেখাটা জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল, 'যে এই গলিতে···'

আবার মুছতে লাগল একজন সেপাই। ঊনত্রিশবার মোছার পর, লেখাটি আর মোছা হল না। সেই অফিসার বদলী হয়েছেন। লেখাটার উপর ধূলো পড়তে লাগল। তারপর একদিন শহরের সব কিছুর মধ্যে আবার আগের মতো অভ্যস্ত হয়ে গেল সকলের, দেওয়ালের লেখাটা।

শুধু জানা গেলনা, কার এই লেখা লেখা খেলা, কেন এই খেলা। কেবল ঠাকুর গলির মেয়েরা তাদের মধ্যাহ্নের অবসাদে, জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, আহা, কী মরণ গো! এত দাপাদাপি কিসের! যারা এই গলিতে ঢোকে, তারা তাছাড়া আবার কী!

মাস্টারমশাইয়ের তন্দ্রাটা কেটে গেল ইতস্ততঃ কতকগুলি আরশোলার আক্রমণে। ঘামে সেঁতিয়ে ওঠা গায়ে কি স্বাদ পেয়েছে পোকাগুলি কে জানে। এমন আচম্বিতে গায়ে উঠে ঘুর ঘুর শুরু করেছে যে ঘুমটা তাইতে আচমকা কেটে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। তারপর তিনি খানিকটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। বোধহয় একটা দুঃস্বপ্নেরও ঘোর ছিল তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্ন কুঞ্চিত মুখে।

কেমন একটা ঘৃণায় দেহটা সিঁটিয়ে উঠে বসলেন তিনি। কাপড়ের আঁচল দিয়ে একটু ঝেড়ে নিলেন জায়গাটা। আরশোলাগুলি তাদের নতুন গজানো পাখনাগুলো চকচকিয়ে একবার বক্র দৃষ্টিতে তাঁকে দেখে ঘরের অন্যান্য মানুষগুলির আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

আজকে কি বার সেটা স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন মাস্টারমশাই। শনি-মঙ্গলবার নাকি আরশোলার ঝাড়-বংশ এরকম জ্বালাতন করতে বেরোয়। কিন্তু না, আজ বৃহস্পতিবার। তাঁর স্পষ্টই মনে আছে—মেয়ে স্বর্ণ আজ সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ছিল।

তবে হয়তো সাপ এসেছে। সাপ! মনে করতেই আবার শির-শির করে উঠল তাঁর দেহটা। 'আস্তিক' আর 'গরুড়' কথাটা তিনবার মনে-মনে উচ্চারণ করে কপালে হাত ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সারা ঘরটায় একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। শুধু কতকগুলি ঘুমন্ত দেহ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

ঐ তো—ভোলা, মদন, কানু, বিভা, স্বর্ণ। স্বর্ণর কোল ঘেঁষে বছর দেড়েকের ছেলেটা—গোঁসাই। ভুঁদো মতো দেখতে বলে সবাই ওর নাম দিয়েছে গোঁসাই। গোঁসাইয়ের পরে তার মা—মাস্টারমশাইয়ের

পরিববার সুধাংশুবালা খানিকটা বেঁকে তুমড়ে শুয়ে আছে। এর মধ্যে সাপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

বাইরে এসে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরের দিকে তাকালেন একবার। তাঁর ঘর!

পাঁচ সাড়ে-পাঁচ হাত লম্বা আর হাত চারেক চওড়া একটা মেঝে খোবলানো কুঠরি। কালি-পড়া ধূসর দেওয়াল। উত্তরে গারদহীন একখানি জানলা আর পূবদিকের এই দরজাটি। মাস্টারমশাইয়ের ঘর। পনেরো টাকা ভাড়া।

পনেরোটা বিষাক্ত কীট যেন একসঙ্গে কামড়ে উঠল তাঁর বুকের মধ্যে। মনে পড়ল নিজের ভিটার কথা। খাল পারের সেই দীর্ঘ গ্রামটার কথা।

দরজাটা টেনে দিয়ে উঠোন ভর্তি ঘুমন্ত দেহগুলির মাঝখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। বাইরে আসতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর গায়ে। চোখ বুজে হাওয়াটুকু উপভোগ করলেন তিনি।

কাঁচা রাস্তাটার দু-পাশ দিয়ে রাস্তাটার চেয়েও প্রায় চওড়া কাঁচা নর্দমা চলেছে। ওতে নোংরা বয়ে চলে না, জমে শুধু। তারপর ভরা বর্ষায় যখন খানা-ডোবা, নর্দমা আর রাস্তা একাকার হয়ে যায় তখন সারা বছরের নোংরাগুলি ভেসে ওঠে। জমা হয়ে ওঠে ঘর-দোরের আনাচে-কানাচে।

রাত্রি কত ঠাওর হয় না।

মাস্টারমশাই রাস্তাটা ধরে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগলেন। কোমর আর ঘাড়টা খানিকটা ঝুঁকে পড়ায় সমস্ত দেহটা ধনুকের মতো ঈষৎ বাঁকা বলে মনে হয়। সেই সঙ্গে জীবনভর পরিশ্রমের মর্যাদায় পা দুখানিও কেমন বাঁকা। একটা পায়ের থেকে আর একটা পা অনেকটা ফাঁক।

রাস্তায় আলো আছে, কিন্তু খুবই স্তিমিত। অবশ্য বৈদ্যুতিক আলোই বটে। সেই আলোয় দীর্ঘ ছায়া ফেলে মাস্টারমশাই পায়চারি করবার মতো ধীরে-ধীরে এগিয়ে চললেন। কেমন একটা রাত-জাগা প্রেতের মতো দেখাচ্ছে তাঁকে।

খানিকটা এসে থমকে দাঁড়ালেন মাস্টারমশাই। মনটা একমুহূর্তে পদ্মার পাড় থেকে কুলইচণ্ডীতলা দিয়ে খর-স্রোতবাহী ধলী খালের ধারে গিয়ে ঠেকল।···ধলী খালের ধার দিয়ে ঝুঁকে-পড়া সেই হিজল গাছ আর বেতবনের পাশ দিয়ে মনটা হু-হু করে গিয়ে পড়ল—নয়ানগরের খালে। ওপারে নয়ানগর এপারে রাজানগর। মাস্টারমশাইয়ের জন্মভূমি, তার পিতৃ-পিতামহের জন্মভূমি। মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বিক্রমপুর পরগণার সেই কুলীন মানী শিক্ষিত লোকের বাসভূমি রাজানগর। তার অদূরেই রাঢ়িখাল, আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাড়ি। বাড়ি নয়, বিক্রমপুরের পূণ্য-তীর্থ। বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্মভূমি।

গরিমায় বুক ভরে ওঠে। অতীত ইতিহাসের পাতাগুলি যেন পদ্মার পাগলী হাওয়ায় একের পর এক উল্টে যায়। কেদার রায়-বারভুঁইঞার রাজত্ব, মুঘলের অপরাজেয় সেনাপতি মানসিংহের অভিযান! এই সেই বিক্রমপুর! এই বিক্রমপুরই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠা নেত্রী সরোজিনী নাইডুর পিতৃভূমি।

এই ঐতিহাসিক বিক্রমপুর পরগণারই বিশাল গ্রাম রাজানগর, মস্টারমশাইয়ের মাতৃভূমি, বাপ-পিতামহের শত বছরের গৌরবোজ্জ্বল ভিটা।

ওই যে, ষোলোঘর, হাসারা। বিক্রমপুরের বিখ্যাত ইংরাজি উচ্চ বিদ্যালয়—ওই হাসারার স্কুল। রাজানগর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। মাস্টারমশাই ওই স্কুলে পড়েছেন, প্রতিদিন যেতে-আসতে দশ মাইল হেঁটে। এণ্ট্রান্স পাশ করেছেন হাসারার স্কুল থেকেই।

তারপর উচ্চ শিক্ষার জন্য অথবা বড়দরের সরকারী চাকরির জন্য

কত লোক দেশ ছেড়ে চলে গেছে। মাস্টারমশাইয়ের কত জ্ঞাতি ভাইয়েরা গেছে। কিন্তু তিনি যাননি।

এ দেশের সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান। তাঁর হৃৎপিণ্ড এ গ্রাম। এ দেশকে শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে, ঐশ্বর্যে ভরে তুলতে হবে এই তো ছিল তাঁর চিরকালের আশা। সত্যকার আশা।

বিদেশের শিক্ষা আর অর্থের প্রলোভন যখনই এসেছে, তখনই লোভী মনকে ঘা দিয়ে ফিরে তাকিয়েছেন এ গ্রামের দিকে। অঞ্জলি ভরে তুলে নিয়েছেন খালের টলমলে স্রোতের জল। ছিটিয়ে দিয়েছেন মাঠে। ফিরে তাকিয়েছেন দিগন্তবিসারী সবুজ মাঠের দিকে। দিকচিহ্নহীন মাঠ। মাঠ নয়, বাঙলার ঐশ্বর্যময় দিগন্তবিসারী ভাঁড়ার। গভীর আবেগে তাকিয়ে দেখেছেন গ্রামের ছেলে-মেয়েদের দিকে, মাঠের মানুষদের দিকে।

না, এদেশ ছেড়ে তিনি যেতে পারবেন না।

বুকের মধ্যে টন-টন করে উঠল মাস্টারমশাইয়ের। ঝুলে-পড়া ঠোঁট দুটো বেঁকে গিয়ে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল।···—আজ মনে হয় চব্বিশ পরগণার এ শিল্পাঞ্চলে দাঁড়িয়ে নিজেকে এতদিন বুঝি পরিহাসই শুধু করে এসেছেন। পরিহাসের আড়ালে প্রবঞ্চনা করেছেন নিজেকে। আজ কোথায় সেই শত বৎসরের গৌরবোজ্জ্বল ভিটা—স্বপ্নে দেখা দেশের সেই সেদিনের অনাগত ছবি? নেই। সেদিনের সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন ঘুম ভেঙেছে বিকট দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা জীবনটাকে ঘিরে ধরতে আসছে আজ স্বর্ণকে—তাঁর মেয়েকে কেন্দ্র করে, হিন্দুস্থানের অধিবাসী হয়ে বাঁচবার সৌভাগ্যকে ঘিরে।

মনটা আবার ফিরে গেল ছেড়ে-আসা দিনগুলির দিকে।

সেদিন দেশের প্রতি অনুভূতি আরও গভীর হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনে। আত্মার সঙ্গে মিশেছিল দেশের মাটির টান।

আত্মীয়-স্বজন সকলের শত অনুরোধ, জীবনের প্রতিষ্ঠার শত মনোরম উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন—ছেড়ে তিনি বেছে নিলেন গ্রামের প্রাথমিক

স্কুল শিক্ষকের জীবন। হ্যাঁ, এ জীবনই তাঁর কাম্য। আশাটা বড় বিরাট, কেমন একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। দেশকে বড় করতে হবে, বিদেশমুখী মানুষের মনকে ফিরিয়ে আনতে হবে এখানে —এই মাটিতে। আর এই আশাতেই বছরের পর বছর চলে গেছে।

যৌবন গেছে, বার্ধক্যের কোঠায় পা দিয়েছেন। আন্দোলনের ঢেউ পদ্মার বুকে এসেও লাগল। স্বরাজ চাই-ই চাই—ভারতের মৃত্যুপণ। কলকাতা, বোম্বাইয়ের রক্তাক্ত ইতিহাস বহন করে নিয়ে এল কাগজ। শত অভাবের মধ্যেও ওই একটি জিনিষ—খবরের কাগজ। তিনি নিয়মিত পড়েছেন।

গ্রামে-গ্রামে সভা-সমিতির সাড়া পড়ে গেল। ঝড়ের বেগে কাটতে লাগল দিনগুলি। আবার বহুদিন পরে শাদা খদ্দরের টুপি মাথায় মাস্টারমশাই ঘুরে বেড়ালেন গাঁয়ে-গাঁয়ে। সারা পরগণার লোক আবার তাঁর তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা শুনল। মানুষ উঠে দাঁড়াল আবার।

মারী-বীজের মতো ঘন বস্তির মাঝখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্তিমিত আলোয় রাত জাগা প্রেতের মতো মাস্টারমশাই অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন—তারপর ?

স্বরাজ।···কিন্তু মাস্টারমশাই বোবা হয়ে গেছেন। নয়ানগরের খালের ধারে বসে দুঃস্বপ্ন দেখার মতো ডুকরে উঠেছেন—তারপর ?

তারপর পিতৃ-পিতামহের শত বছরের গৌরবোজ্জ্বল ভিটা, তাঁর শেষ আশা ছাড়বার সেই দিনটা !

তবু তার পরেও কিছু আছে। তাঁর মেয়ে স্বর্ণ। সেই স্বর্ণর জীবনটাকে দু-হাতে ছিঁড়ে ফেলার আগামী নতুন আয়োজন।···

চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল প্রাণের চেয়ে প্রিয় সেই সব মূর্তি মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দার বল্লভ-ভাই।···জাতির সেই প্রতিনিধিদের।

গভীর আবেগে অনুশোচনায় যুক্ত-কর কপালে ছোঁয়ালেন।—ক্ষমা

কর, অবুঝ অবোধ আমরা ভুল বুঝি। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান তোমরা, তোমাদের কথা আমাদের বেদবাক্য।

কী যেন ঠেলে এল মাস্টারমশাইয়ের গলা দিয়ে। দাঁতে দাঁত চেপে রইলেন। কোটরাগত চোখের কোণে চক্‌চক্‌ করে উঠল দু-ফোঁটা জল।—ক্ষমা কর, তোমাদের অন্তর্নিহিত কল্যাণের সেই ফল্গুধারা আমরা দেখতে পাইনে!...

অসম্বৃত পদবিক্ষেপে ফিরে এলেন মাস্টারমশাই।

'বাবা!'

চমকে দাঁড়ালেন মাস্টারমশাই। দরজায় দাঁড়িয়ে স্বর্ণ। তাঁর মেয়ে।

আচম্বিতে সর্পদংশনে যেন মুহ্যমান হয়ে গেলেন তিনি। এই স্বর্ণর বিয়ের স্থির হয়েছে।

স্বর্ণর বিয়ে? স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলেন তিনি স্বর্ণর দিকে।

মেয়ে মাত্র তাঁর একটিই ওই—স্বর্ণ। লেখাপড়া শিখিয়েছেন তিনি স্বর্ণকে। জীবনের সমস্ত আদর্শ দিয়ে গড়েছেন ওকে। তাঁর জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটির সঙ্গে জড়িত।

আবার সেইসব দিনগুলির কথা মনে পড়ল তাঁর। তিনি যখন সেই শাদা খদ্দরের টুপি মাথায় দিয়ে এগাঁয়ে সেগাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন—তখন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গিনী ছিল স্বর্ণ। তাঁরা উভয়ে মিলে পড়েছেন পূজ্য নেতাদের বাণী।

কিন্তু অকস্মাৎ ধূমকেতুর মতো ছড়িয়ে পড়ল দাঙ্গা।

মাস্টারমশাইয়ের তখন পাগল হ'তে বাকি ছিল। নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলেন। ঘুরে বেড়ালেন মহকুমার প্রতি কেন্দ্রে। মুন্সীগঞ্জ থেকে মালখানগর, সিরাজদিয়া থেকে হাসারা।...দাঙ্গা থামল না।

তারপরই পাঁচুই জুন কাগজ খুলে দেখলেন—তেসরা জুনের সেই বেতার-বক্তৃতা। উনিশ শো সাতচল্লিশ সালের তেসরা জুন।

অকাতরে মেনে নিলেন পণ্ডিত নেহেরু, জিন্না—মাউন্টব্যাটেন সাহেবের বাঙলা বিভাগের নীতি, প্রতিটি জেলাকে চুল-চেরা ভাগের নির্দেশ। প্রথম পাতাতেই তেসরা জুনের সেই বেতার-বক্তৃতা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ছাপানো হয়েছে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন মাস্টারমশাই।

আর সেই দিন থেকেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন মাস্টারমশাই। বুকের মধ্যে একটা আচমকা বেদনায়—কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল জিহ্বা। নীরব অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা।

সেই দিন থেকেই বোবা হয়ে গেছেন মাস্টারমশাই।

বাইরের থেকে শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এসে ঘরের কোণে দাঁড়ালেন স্বর্ণর মুখোমুখি। শুধু তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন—'এ কী হল ?'

স্বর্ণ তো নারীর বেশে তাঁরই প্রতিচ্ছবি! সেও পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দুরন্ত খাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। জবাব দিতে পারল না। মনে মনে বলল সেও—এ কী হল ?

তাঁর পরিবার সুধাংশুবালা নিতান্তই অর্বাচীন গ্রাম্য মেয়েমানুষ। তার কাছে জীবনের গণ্ডি খুবই সংকীর্ণ। ছেলেরা সবাই স্বর্ণর ছোট। তাদের তিনি আমলই দেন না। তারা অত্যন্ত ভীতু, সংকুচিত, বাপ তাদের কাছে মূর্তিমান যমরাজার মতো বিভীষিকা।

তাঁর প্রথম মৃত তিনটি সন্তানের পর স্বর্ণ। অত্যন্ত ছোট আর শীর্ণ দেহে জন্ম নিয়েছিল সে, আর অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। স্বর্ণর মা ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে হঠাৎ ব্যথায় নীল হয়ে ঢেঁকি ঘরেই স্বর্ণর জন্ম দেন। মাস্টারমশাই তিনটি মৃত সন্তানের ক্ষত বুকে নিয়ে বলেছিলেন, 'জ্বালাতে আসছিস, তার তর সইছে না? শত্রু কিনা! বুকে শেল দিতে যারা আসে তারা অমনি করেই আসে।'

কিন্তু না, সেই ক্ষীণজীবী স্বর্ণ বেঁচে রইল, বড় হল। মেয়ে হলেও মাস্টারমশাইয়ের উপযুক্ত প্রতিনিধি স্বর্ণই। সেই স্বর্ণর বিয়ে!··· বিয়ে ?

মাস্টারমশাইয়ের ইচ্ছা হল চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেন। আর্তনাদ করে অভিশাপ দেন।

কিন্তু কাকে অভিশাপ দেবেন? কাকে দায়ী করবেন এই ঘোর অনাচারের জন্য?

'বাবা!' স্বর্ণ আবার ডাকল।

'অ্যাঁ, কী বলছিস্?,

'বাড়ী আসুন। এখন অনেক রাত, বাইরে ঘুরছেন কেন?'

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে তিনি স্বর্ণর কাছে এসে বললেন, 'সোনা আমি তোর এ বিয়ে দেব না।'

'এই সব কথা ভাবছেন বুঝি রাত্রে রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে? বাড়ি আসুন।' স্বর্ণ বাবার হাত ধরল।

'না, সোনা, এ বিয়ে আমি কেমন করে দেব? আমি যে তোর বাপ! আমার শত দুঃখের মধ্যেও এ দুঃখ আমি সইতে পারবো না।'

স্বর্ণ ফিরে তাকাল বাপের হাড়-বের-করা বুকটার দিকে। দ্রুত নিশ্বাসের টানে হাড়গুলোর স্পষ্ট কম্পন দেখতে পায় সে। ইচ্ছে করে —ওই বুকে মাথা রেগে খানিকক্ষণ কেঁদে নেয়। কিন্তু না, কাঁদলে তার চলবে না। জীবনে কবে সে কি ভেবেছে, সে কথা আজ তাকে ভুলতে হবে।

'এসব কথা ভাববার সময় বুঝি এটা?' বাবার হাত ধরে টান দিল সে।

'—আসুন?'

প্রতি-উত্তর না করে বাড়ী ঢুকলেন তিনি। কণ্ঠে তার সে দৃঢ়তা কোথায়—উত্তর করবার মতো! শুধু বললেন, 'আমি কী অপরাধ করেছি, সোনা, যে আজ আমাকে এসব সইতে হবে?'

সে কথার কোনো জবাব দিতে পারল না স্বর্ণ।

রাত পোহাল।

সারা বাড়িটা জেগে উঠল। বাড়ি নয়, বাজার। এইটুকু বাড়ির

মধ্যে এতগুলি পরিবার কেমন করে থাকে, স্বচক্ষে না দেখলে কল্পনা করাও দুষ্কর। পিল-পিল করে পিঁপড়ের ঝাঁকের মতো বেরিয়ে এল সব খাঁচা ছেড়ে।

পূর্ব বাঙ্গালার হিন্দু এরা। পাকিস্তান ছেড়ে সককে চলে এসেছে হিন্দুস্থানে।

এ বাড়ির লোকদের সেদিন মেথরটা 'জানোয়ারের বাচ্চা' বলে গালাগালি দিয়ে গেছে! এ পাড়াটায় বিশেষ করে এ বাড়িটায় দিনে দু-তিনবার করে খাটতে হয় তাকে।

মেথরের গালাগালি তো দূরের কথা, অনেক কিছুই হজম করে নিচ্ছে এরা।

মাস্টারমশাই একটা চৌকো টিন আর একটা বালতি নিয়ে চললেন জলকলের দিকে। সেখানেও একটা ছোটখাট হাট বসেছে। এখন যাচ্ছেন, কম করে দু-ঘণ্টার আগে আর জল নিয়ে ফিরতে পারবেন না।

আর এই দেখে পুরনো বাসিন্দা ও স্থানীয় অধিবাসীরাও রাতদিনই গালাগালি দিচ্ছে। একদল বখাটে ছোকরা বেরোয় এদের দেখতে। মেয়েদের দেখলে উচ্ছ্বাসের বশে দু-এক কলি গান, এক-আধ রেশ শিস ও বেরিয়ে পড়ে। তবে হ্যাঁ তারাও তাজ্জব মেনেছে! বলে, শালারা ওইটুকুন জায়গায় থাকে কোথায় মাইরি!'

ইদানীং এদের আলোচনাটা স্বর্ণকে কেন্দ্র করে একটু বেড়ে উঠেছে। 'মাইরি প্রাণের জ্বালায়' সেদিন রবিঠাকুরের কবিতা 'কোট' করে একখানি চিঠি ছুঁড়ে দিয়েছিল উত্তরের জানালাটা দিয়ে।

চিঠিটা পড়েছিল মাস্টারমশাইয়ের কোলে। স্বর্ণ রান্না করছিল। মাস্টারমশাই চিঠিটা স্বর্ণর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, উনুনে ফেলে দেতো কাগজটা। বিন্দুমাত্র কৌতূহল না করে স্বর্ণ চিঠিটা ফেলে দিয়েছিল জ্বলন্ত উনুনে।

বালতি নিয়ে যেতে-যেতে মাস্টারমশাইয়ের মনে পড়ল আজ এ

বেলাটাই শেষ। ও বেলাই তারা নূতন বাড়িতে চলে যাবেন। এক-খানা আলাদা বাড়ি। শরিক নেই, ঝঞ্ঝাট নেই। সুখে থাকতে পারবেন সেখানে। সেখানেই কাল স্বর্ণর বিয়ে !···

একটা হোঁচট খেলেন মাস্টারমশাই।···তাঁর মেয়ের জামাই, স্বর্ণর বর সেই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। তাঁর সুখ-শান্তি—অভাবের বিনিময়ে স্বর্ণকে বিয়ে করবেন তিনি। বিয়ে করবেন নয়, দয়া করবেন।

স্বর্ণর স্বামী! মাস্টারমশাইয়ের অবস্থা দেখে দয়া হয়েছে তার। ইস্কুল মাস্টার, কীইবা আছে তাঁর। গাঁয়ে তাঁর কয়েক বিঘা ধান-খেতই সম্বল। আর পিতৃ-পিতামহের সেই ভিটা। কিন্তু এখানে তার মূল্য নেই। এখানে বাঁচতে হলে অর্থের প্রয়োজন। খেয়ে পরে বাঁচা তো দূরের কথা, মাস্টারমশাই কণ্টকিত হয়ে উঠেছিলেন, তিনি কেমন করে ওই অন্ধ কুঠরিটার ভাড়া যোগাবেন।

কিন্তু পরমেশ্বরের দয়া হয়তো এটা। দুর্দান্ত পরাক্রমশালী এখান-কার লেবার অফিসার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী মহাশয় দয়া করে তাঁর স্বর্ণকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন, সেই সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের জীবনেরও নিরাপত্তা; হিন্দুস্থানের অধিবাসী হওয়ার সুযোগ পাবেন তিনি। চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় তাঁদের আপিসে এই বৃদ্ধ বয়সে একটি কেরানীর পদও মিলতে পারে।

শুধু ফিরে পাওয়া যাবে না নয়ানগরের খালের ওপার গ্রাম রাজানগর। পিতৃ-পিতামহের সেই ভিটা। করবী, মালঞ্চ আর গন্ধরাজ গাছ ছাওয়া সেই বাড়ি, সাতপুরুষের সেই তুলসীমঞ্চ। কামরাঙা আর আম, জলপাই আর 'রোয়াইল' কেটে-কেটে রোদে শুকুতে দেওয়ার দরকার হবে না এখানে, পাওয়াও যাবে না। গোবর-লেপা উঠোনের উপর ধান রোদে দেওয়ার দরকার নেই, দরকার নেই খেগো পাখি তাড়াবার নানান ফন্দি আঁটবার। জন্মভূমির সেই পরিবেশ এখানকার কোলাহলমুখর কলকারখানার ইমারতের বাজারে আনাচে-কানাচে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আর প্রয়োজন হবে না স্কুলে যাওয়ার। আর পাওয়া যাবে না সেইসব ছেলেদের যাদের মাস্টারমশাই তৈরি করেছেন, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার, কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, নেতা। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন কোনো গুণী যুবককে দেখিয়ে বলা চলবে না—এ আমার ছাত্র! জেলাবোর্ডের তরুণ কর্মকর্তারা আর কোনোদিন তাদের পুরনো মাস্টারমশাইয়ের পায়ের ধূলো নেবে না।

দূর-দূরান্তে গ্রামের মানুষরা আর কোনোদিন তাদের সেই প্রিয় লোকটিকে দেখতে পাবে না খদ্দরের টুপি মাথায় দিয়ে এসে যে তাদের নিস্তেজ রক্তে প্রাণের ঢেউ বইয়ে দিত ডাক দিত—স্বরাজের। তার আর প্রয়োজন নেই। সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

আজ এই বৃদ্ধবয়সে তাকে হতে হবে মেশিনের মতো মানুষ। ছায়াতল প্রাঙ্গণে ভরা কচি-কচি মুখ তো নয়, টেবিল ভর্তি চটকলের হিসাব নিকাশের খাতা। মেধাবী ছাত্রের মাথায় আদরের স্নেহচুম্বন নয়, মালিকের চোখ রাঙানি। শিক্ষা দেওয়া নয়, জীবনে নতুন করে শিক্ষা নিতে হবে তাকে।

আর স্বর্ণ! শিক্ষায়-দীক্ষার যাকে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন মহিমময়ী স্বর্ণকে দেশনেত্রীদের পাশে বসিয়ে আঁতুড়ঘরের সেই ক্ষীণজীবী মেয়েটি তাঁর—কাল তাকে সম্প্রদান করতে হবে।

লেবারবাবু কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর পাশে বধূবেশে দেখতে হবে তাকে।...

একটা দুরন্ত হোঁচট খেয়ে আঙুলের নখটা উঠে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল মাস্টারমশাইয়ের। ফিরে দেখলেন জলকল ছাড়িয়ে চলে এসেছেন। যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে ফিরে এলেন আবার।

পরদিন।...

মাস্টারমশাইরা এসেছেন নতুন বাড়িতে। সত্যই, সুন্দর বাড়িখানি। পরিষ্কার ধোয়া-মোছা দুখানি বড়-বড় ঘর, একখানি রান্নাঘর,

বাঁধানো উঠোন, জলকলও আছে। এ বাড়িতেই আজ স্বর্ণর বিয়ে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। কৃষ্ণকান্তবাবুর আত্মীয়রা এসেই সব বিয়ের ব্যবস্থা করছেন। তাদের ছেলেমেয়েও এসেছে মেলাই। বহুমূল্য রত্নালংকারে স্বর্ণকে কনে সাজাচ্ছেন তাঁরাই। যা দু-চারজন বন্ধুবান্ধব আসবেন চৌধুরীমশাইয়ের, তাদের জন্য রান্নাবান্নাও তারাই করছেন। একটি গ্রামোফোন এসেছে। গান হচ্ছে কত রকমারি।

মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী সুধাংশুবালা ভাবলেশহীন গম্ভীরমুখে ঘুরে-ঘুরে সব দেখছেন শুধু। তার মনের প্রতিচ্ছবিটুকু বিন্দুমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না চোখের মধ্যে। কেবল স্বামীর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই কী দুরন্ত অভিযোগে যেন চোখের মণি দুটো জ্বলে উঠছে।

আর মাস্টারমশাই দূর থেকে বসে-বসে দেখছেন তাঁর স্বর্ণকে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছেন—কেমন করে সাজানো হচ্চে তাঁর মেয়েকে।

সুগন্ধি তেল মেখে মাথা আঁচড়ে সিঁথিতে পরিয়েছে সোনার টায়রা। কানে দাক্ষী পাথরের দুল। গলায় উঠেছে বিচিত্র মনোহারি সোনার হার। হাতে বেঁধেছে আর্মলেট, তার সঙ্গে সাবেককালের চিত্রিত অনন্ত। সূক্ষ্ম কারুকার্যবহুল রুলী পরিয়েছে নিভাঁজ মণিবন্ধে, ঝকমক করছে সোনার চুড়ি, সরু নাকের পাটায় লাগিয়েছে নীলপাথরের নাকছাবি। চোখে কাজল টেনে দিয়েছে, শ্বেত আর লাল চন্দনের সরু চিত্রাঙ্কন হয়েছে কপালে আর গালে।

হঠাৎ শাঁখ বেজে উঠল। বর এসেছে, বর এসেছে!

বিখ্যাত লেবার অফিসার কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী মহাশয় এলেন বর বেশে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে।

চৌধুরী মহাশয়ের নাতি-নাতনীরা হাততালি দিয়ে উঠল—'দাদু এসেছে! ওমা, দাদু কেমন সেজেছে!' মেয়েরা মুখ টিপে হাসলেন।

হাসলেন চৌধুরী মহাশয়ও। ঝকঝক করছে শাদা দাঁতের সারি। চীনা দোকান থেকে নতুন নকল দাঁত লাগিয়েছেন তিনি। ঠোঁট দু'খানি

আর চোপসানো বলে মনে হয় না। গায়ে পরেছেন আদ্দির পাঞ্জাবী, গলায় চড়িয়েছেন উড়ূনি, শুভ্র পক্ক ভ্রূতে কলপ মাখিয়ে কালো কুচকুচে করেছেন। রেখাবহুল মুখ উগ্র প্রসাধনে মাটির মূর্তির মতো শাদা হয়ে উঠেছে।

মাথার চুলে কলপ মাখিয়ে তার উপর একখানি শাদা খদ্দরের টুপি পরেছেন। নিজস্ব পছন্দমতোই পরেছেন। আজকালকার মেয়েরা এ টুপি দেখলে খুশি হয়। তা ছাড়া. এ টুপি না পরলে আজকালকার মানুষ বলে পরিচয় দেওয়া যায় না।

উলু দিল এয়োরা। শঙ্খধ্বনি উঠল মুহুর্মূহুঃ।

মাস্টারমশাই অন্ধকারে এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখছেন তাঁর স্বর্ণকে। মহারাণীর মতো সেজেছে তাঁর স্বর্ণ। স্বর্ণ স্বর্ণ-ই। কচি পুনর্ণভা লতার মতো শ্যাম সোনালী স্বর্ণ তাঁর। আনত চোখে বসে আছে।

স্বর্ণর বিয়ে! প্রাণ হু-হু করে উড়ে গেল আবার সেই ভিটায়। সেই ঢেঁকি ঘরের আনাচে। সেখানে জন্মেছিল তাঁর স্বর্ণ!

'আপনি এখানে?' বলে কে যেন ঝুঁকে পড়ল মাস্টারমশাইয়ের পায়ের উপর, মাস্টারমশায়ই চমকে দু-পা পিছিয়ে গেলেন।

চৌধুরী মহাশয় হাঁপানী আক্রান্ত ন্যুব্জ দেহে শ্বশুরের পদধূলি নিতে এসেছেন। ঝুঁকে পড়তেই মাথা থেকে টুপিটা খসে পড়ল। টুপিটার ভিতর দিকে কলপের ছোপ লেগে গেছে।

নাতি-নাতনীরা হাততালি দিয়ে উঠল।—'এ মা—দাদুর টুপি পড়ে গেল।'

'ছি-ছি, এ কী করছেন আপনি?' মাস্টারমশাই প্রতি নমস্কার করে চকিতে সরে গেলেন সেখান থেকে। এয়োরা সব চোখাচোখি করে হেসে কুটিপাটি হল।

তারপর বসল বিয়ের আসর। শাঁখ বেজে উঠল। বর-কনে এল ছাঁদনা তলায়! পুরুত সুর করে শুরু করলেন মন্ত্রোচ্চারণ।

সময় এল সম্প্রদানের। ডাক পড়ল মাস্টারমশাইয়ের।

সম্প্রদান ! ধ্বক্ করে উঠল মাষ্টারমশাইয়ের বুকের মধ্যে। সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল।

কম্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন তিনি।

কাকে সম্প্রদান করবেন ? একি সম্প্রদান ?

বৃদ্ধ চৌধুরীর লোল-কুঞ্চিত ডান হাতে স্বর্ণর মসৃণ বাঁ হাতটি ন্যস্ত হয়েছে। ঢুলু-ঢুলু নয়নে হাসছেন চৌধুরী। মাটির প্রতিমার মতো স্থির অবিচল স্বর্ণ। মাটির দিকে চেয়ে বসে আছে।

'কই, আসুন !' পুরুত ডাকলেন মাস্টারমশাইকে।

মাস্টারমশাই তার কম্পিত হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন ওই দুটো হাতের উপর। একটি লোলচর্মকুঞ্চিত, আর একটি নিটোল শ্যাম চিকন হাত।

হ্যাঁ, হিন্দুস্থানের অধিবাসী হয়ে বাঁচতে হলে, জীবনের নিরাপত্তার জন্য এ-কাজ তাঁকে করতে হবে।

সম্প্রদান করতে হবে—এমনি করে—তাঁর নিজের হাতে গড়া স্বর্ণকে।

পুরুত মন্ত্রোচারণ করলেন !···

মাস্টারমশাই সংস্কৃতে প্রতিধবনি করতে লাগলেন, আমার কন্যাকে এতদিন আমি খাইয়ে মানুষ করেছি, এবার তোমার হাতে দিলেম। গ্রহণ কর। চৌধুরী প্রতিধবনি করে, তার বুড়ো কম্পিত গলায়, গ্রহণ করলেম।

হু-হু করে একটা শক্ত ডেলার মতো কী যেন ঠেলে এল মাস্টার-মশাইয়ের গলার কাছে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সব কিছু ঝাপসা হয়ে গেল চোখের সামনে। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল থরথর করে। হাহাকার করে উঠল বুকের মধ্যে। কী অপরাধ করেছি আমি ! আজ কেন আমি দেশছাড়া, ভিটাহারা বল—

চোখের উপর ভেসে উঠল প্রাণের চেয়ে প্রিয় সেই তাঁদের মূর্তিগুলি।

বল,—আজ কেন এ-বিসর্জন দিতে হল আমাকে ? বড় অবুঝ, বড় অবোধ আমরা, চিরকাল তোমাদের পথ ধরে এসেছি, কিন্তু আজ এ কী হল ?

পুরোহিত শেষবারের জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করে সম্প্রদান পর্ব শেষ করলেন। অমনি বিরহিনী গো-সাপিনীর মতো লু-লু করে উলু দিয়ে উঠল এয়োরা।

জয়নাল

জয়নাল আমার বন্ধু। সে থাকত, দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনের পুবে, তিন মাইল দূরে। বিলান দেশ, তাই ছ'মাস সে আসত পায়ে হেঁটে, ছ'মাস নৌকায়।

যখন হেঁটে আসত, তখন তিনি মাইল পুরো হাঁটতে হ'ত, যখন নৌকায় আসত তখন, ওই তিন মাইল হ'ত দেড় মাইল।

কেন না, দোলাইগঞ্জের রেললাইনের উঁচু ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে এই যে দেখা যায় বহু দূর দিগন্ত ভাসিয়ে থই থই করছে বর্ষার জল, যার কোথাও বিস্তৃত কচুরিপানা বা জলঘাসের নোয়ানা মাথা, কোথাও আকাশের ছায়া টলটলে জলে, পাশে তার কলমী হিঞ্চের দাম উদ্দাম হয়ে ছড়িয়ে আছে বহু বাহু মেলে, কিম্বা কোথাও আচমকা জেগে ওঠা কিশোরী পাট গাছের সটান ডাঁটার অজস্র মাথা, এরই ধারে ধারে জয়নাল তার ডিঙ্গি নৌকাটি নিয়ে সোজা পাড়ি দিত ওই দিগন্তে মেশা গাঁয়ের কাল্‌চে রেখার দিকে। ওই যে দেখা যায় একটা মন্দিরের একটুখানি মাথা, তারও পিছনে ঝাপ্‌সা রেখা দুটি মসজিদের মিনার, ওইখানেই জয়নালদের বাড়ী। বন্যাকালে এ সোজাপথটুকু যেতে তাকে ভাঙতে হয় লালমাটীর তিন মাইল উঁচুনীচু বাঁকা পথ।

এই যে জল, এটা কোন নদী নয়, খাল নয়, নয় কোন গাঙ; বহু খাল নালার মারফৎ এসে ছোট বিলের বুকে মহাসঙ্গম ঘটেছে ধলেশ্বরী ও শীতলাক্ষার, যার মৃদু আবর্ত নাকি তটকে দিয়েছে একেবারে ভাসিয়ে। দুয়ে মিলে এর এক স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ। হঠাৎ হওয়ায়

শিউরে ওঠা এ টলমলে জল ও তার বন, নীড়বিবাগী মাছখেকো পাখী ও ফড়িংএর ভিড়, কই, জিয়ল, ট্যাংরা ও পুঁটির আচমকা ভেসে উঠে পুচ্ছ নাড়ার চকমকানি ও চকিতে অতলে ডুবে যাওয়া, আর উপরে মেঘভারাতুর উদার আকাশ, এসবের কথা যে বার বারই বলতে ইচ্ছে করছে, তার কারণ জয়নালের রূপ।

কেন না, জয়নালের কালোচোখের অতল চাউনি, তার চিকন শ্যামল রং, মাথায় অবিন্যস্ত শ্যাওলা রংএর চুল, বড় বড় সাদা ঝকঝকে দাঁতের হাসি, দীর্ঘ শক্ত শরীর এবং অখণ্ড নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বহুতল থেকে উঠে আসা অল্প ও গম্ভীর কথার সুর, এসবের সঙ্গে ওই প্রকৃতির কোন তফাৎ নেই। ওই প্রকৃতি ও জয়নালকে দেখা যেন এক জনকেই দেখা।

জয়নাল দোলাইগঞ্জ পেরিয়ে গেণ্ডারিয়ার একটা হাইস্কুলে পড়তে আসত। আসত সকালবেলা মাথায় শাক তরকারীর বোঝার উপরে পাঠ্যবই দড়ি দিয়ে বেঁধে। সূত্রাপুর বাজারে শাক তরকারী বিক্রী ক'রে ওখানেই এক মুসলমান মহাজনের গদীতে ব'সে পড়াশুনো করত। তারপর চান করে, নাস্তা করে চলে যেত স্কুলে। স্কুল শেষে বাড়ী।

তার সঙ্গে আমার পরিচয়টা স্কুলেই ঘটে, কিন্তু বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল স্কুলের পাঁচিলের বাইরে, শহরের সীমা ও দোলাইগঞ্জ পেরিয়ে, জলে স্থলে, মাঠে ঘাটে। জলেডোবা পাটক্ষেতের ভিতরে ডিঙ্গি নৌকা ঢুকিয়ে তামাক খেয়ে আর কাঁচা বুকে তার ধক্ সইতে না পেরে হাসিতে কাশিতে স্তব্ধ বিল ও আকাশকে সচকিত করে দিয়ে।

জয়নাল মনযোগ দিয়ে স্কুলে পড়ত, আর বাড়ী ফেরার জন্যে তাড়াতাড়ি ছুটত পূবে।

আমি প্রায় কোনদিনই স্কুলে পড়তে যেতুম না, আর বাড়ী ফেরার কথা মনে হলেই আমার কিশোর মনে একটা তিক্ত বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠত।

জয়নাল বাড়ী ছেড়ে পালাবার কথা ভাবতেও পারত না, আমি বাড়ী থেকে প্রায়ই পালিয়ে যেতুম। জয়নালকে কোনদিনই মার খেতে

দেখিনি, আমার গায়ে এক লাঞ্ছনার দাগ মিশে না যেতে আসত আবার উজান লাঞ্ছনা। জয়নাল শিষ্ট, আমি অশিষ্ট। সে গম্ভীর, চঞ্চল। সে ছিল হিসেবী, আমি বেহিসেবী। মিতালিতে সে বিনীত, আমি দুর্ব্বিনীত। আমাদের এ বিপরীত চরিত্রে দুটো হিন্দু মুসলমান ছেলের মধ্যে তবু কেমন করে যে এমন গম্ভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল, সেটা বিস্ময়েরই এবং সে বন্ধুত্ব দুদিক থেকে ছুটে ধলেশ্বরী ও ও শীতলাক্ষার মিলনে আমাদের এ প্রাণ বিলকে ঢেউ বন্যায় কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

সেদিন এমনি এক বর্ষার দিন। বৃষ্টি ছিল না। নীল আকাশের এখানে ওখানে সাদা ধবধবে মেঘ যেন ডানা মেলে দেওয়া রাজহাঁস। পূবের জলো হাওয়ায় ঝড়ো বেগ। সে হাওয়ায় ভেসে আসছে কোন্ জন্ম বাউলের বাঁশীর সুর। সে সুরে ঘর ছাড়ার ডাক।

জয়নালও বেরিয়ে এল স্কুল থেকে। বাঁশীর সুর বোধহয় আজ ওর কানেও গিয়েছিল। আমি তো ছিলুম ওরই অপেক্ষায়। ও এসে আগেই বলল। মধু, আইজ আর পড়াশুনায় মন লাগতেছে না, চল্ যাইগা কোনখানে!

কোনখানে মানে হচ্ছে জয়নালের বাড়ী। আর আমি তো ছিলুম পা বাড়িয়ে! বললুম, চল।

কিন্তু তখন জানতুম না, আজকের এ হাওয়া শহরের বুকে লাগিয়ে দিয়েছে আর এক সর্বনাশের মাতন! দাঙ্গার আগুন জ্বলেছে দিকে দিকে। সূত্রাপুরের দোলাইখালের জল রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। জানতুম না, শহরে চলেছে তখন লুট আর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে খুনেদের লোফালুফি।

আমরা এসে ডিঙ্গিতে উঠলুম। পাতলা ছোট ডিঙ্গি লাফিয়ে উঠল। ডিঙ্গি নৌকা যেন কিশোরী চঞ্চলা। একটু হাওয়া বা নাড়া পেলেই সে নেচে ওঠে।

ডিঙ্গিতে থাকত জয়নালের বাবার একটি হুঁকো কল্‌কে, একটি ছোট মালসা আগুনের। বাঁশের খোলে তামাক আর টিকে।

আমি ধরি লগি বাঁশ, সে ধরে বৈঠা। লগির খোঁচায় আমি ডিঙ্গি চালাই বিপথে, বৈঠার টানে সে নিয়ে আসে পথে। কিছুক্ষণ চলে আমাদের এই পথে-বিপথের খেলা, চড়া হাসি ঘা খায় আকাশে।

হাসির শব্দে গুপ্‌ করে জেগে ওঠে জলঘাস বা কলমীদাম ফুঁড়ে দু'একটা মানুষের মাথা, ঝিকিয়ে ওঠে হাতে তীক্ষ্ণ ফলার ল্যাজা। হাসি চকচকিয়ে ওঠে মুখে।

লোকগুলো একশ্রেণীর জলচর, মাছশিকারী। মানুষ তো দূরের কথা, মাছও টের পায় না বিলের কোন্‌খানে ওৎ পেতে আছে তাদের মৃত্যুদূত। যেন বকের মত। বললুম, জয়নাল, বিষ্টি হইলে আইজ মাছ উজাইতে পারে। না ?

এসব বিষয়ে জয়নাল অনেক অভিজ্ঞ। সে বলল, মাছ তো আর এমনে উজায় না, অমাবস্যা পুন্নিমার কটাল হইলে হয়। ক্যান্‌, মাছ ধরবি নাহি ?

আইজ রাতে ধরলে হয়, অ্যাঁ ?

জয়নাল কোন কথা বলে না। দু'জনেই আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসি।

অন্ধকার রাতে জলে বিলে ফিরে ফিরে মাছ ধরা, প্রতি মুহূর্তে মাছ-লোভী জল পেতনীর অস্তিত্ব ও ঘাড়ের কাছে তার নিশ্বাস অনুভব করা, আচমকা যেন কার নাকি গলায় মাছ চাওয়ার কথা শোনা ছিল আমাদের রোমান্সের একটা দিক।

আজ ঢেউ ভারী বিলে, বেতবনের শন্‌ শন্‌ শব্দ আসে কানে।

আমি বক্‌বক্‌ করি শহরের বুকে কি ঘটন অঘটন ঘটেছে তারই কাহিনী। তার কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যে। এই পনের বছর বয়স জয়নালের, শহরে আসে পড়তে, কিন্তু একদিন ঢাকার নবাব বাড়ীও তার দেখা হয়ে ওঠেনি। আমি শোনাই তাকে সে কথা।

সে তাড়াতাড়ি সুতোর থলি থেকে বের করে আমচুর আর আমসত্ব।—নে, আমায় দিছিল খাওনের লেইগ্যা।

খামু। সে নিজের জন্ম এক চিমটি রেখে সবটুকু তুলে দিল আমার হাতে। আমি নির্বিবাদে তা একগালে পুরে দিলুম।

জয়নাল তার বড় বড় দাঁতে এক ঝলক হেসে বলে, চুকা মিঠা এক লগে খালি?

আমার জিভ্ তখন উভয় রসে ভ'রে গেছে। খালি হাসলুম।

মনে পড়ে, বন্ধুত্ব হওয়ার পর জয়নাল একদিন থলে ভরে নিয়ে এসেছিল মেলাই ফলপাকুড়। শশা, নারকোল, লঠকন, ডউয়া, চিঁড়ে মুড়ির মোয়া, নারকেলের সন্দেশ, বাজার থেকে কেনা ইরাণী খেজুর। বলেছিল, দোস্তির খাওয়া। তুই দিবি আমার মুখে, আমি দিমু ত'র মুখে, এইডা কানুন।

এক বনের মাঝে লুকিয়ে আমরা দোস্তির ভোজনপর্ব উপভোগ করেছিলুম।

এদিক ওদিক দেখে আমরা ডিঙ্গি ঢুকিয়ে দিলুম পাটক্ষেতের মধ্যে। সে যেন গহন অরণ্য। তায় আজ আবার পাটক্ষেতে লেগেছে মাতন। ডিঙ্গিও যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়।

আরম্ভ হয় তামাক খাওয়ার পালা। জয়নাল যতটা গম্ভীর হ'য়ে হুঁকো টানত, আমি আবার তা পারতুম না। এটা আমার কাছে ছিল যেন বিরাট কুটিল বাধা ডিঙিয়ে এক মহামুক্তির স্বাদ। জয়নালের বাড়ীতে ছিল না বিশেষ আপত্তি এই তামাক খাওয়ায়।

জয়নাল পাকা বুড়োর মত হুঁকো টানতে টানতে বলল মধু, —বাপজানে কয় যে, মেটিক পাশ করলে, মোক্তারি পড়াইব।

মোক্তারি? আমরা দু'জনে হো হো করে হেসে উঠলুম গলা ছেড়ে, আমাদের চোখে বারবার ভেসে উঠল গোঁফওয়ালা এক বিদঘুটে বুড়োর মুখ, গোল চোখে তার ধূর্তের চাউনি।...মোক্তার? যত ভাবি, তত হাসি।

আরো কি কয়, শুনছস্‌নি? বলে সে লুঙ্গিতে মুখ মুছে হাসে মিট্ মিট্ ক'রে।

আমি সে হাসির ভাবার্থ না বুঝে বললুম, কি ?

বলতে তবু বাধে জয়নালের। বলে,—কয়, এই বছরডা গেলে, আমারে নাকি সাদী দিব।

হ ?

হ।

হাসিতে আমার পেট ফেটে যাওয়ার যোগাড় হ'ল। এইটুকু জয়নালের বিয়ে ? ওর সঙ্গে নিজেকে বিচার ক'রে আমি একেবারে হাসিতে মাতাল হয়ে গেলুম এই পূবে হাওয়ার মত। মাথায় উঠল তামাক খাওয়া।

কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে যতই বিস্ময়ের ও হাসির হোক, জয়নালের তা নয়। ওর বাপ ভাইসাহেবেরা ওর মত বয়সেই বিয়ে করেছিল।

সুতরাং ও কেন করবে না ?

কিন্তন্ আমি কইছি বাপজানরে যে, মোক্তারি আমি পড়ুম না। এম. এ পাশ কইরা আমি কইলকাত্তায় বড় চাকরি করুম। আর সাদী···

পাটক্ষেতের হাওয়ার ঝাপটায় ভেসে গেল তার গলা।

বললুম, কি রে ?

সে বলল, মধু, তুই যদি কস, তবে করি।

মহা ভাবনার কথা। এবার আর হাসি ঠাট্টা নয়। দুই বালক বন্ধুতে আমরা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলুম পাটক্ষেতের মধ্যে, দোলায়মান ডিঙ্গিতে।

শেষে ঠিক করলুম, এটা বড় কম সম্মানের কথা নয় যে, এ বিষয়ে আমি হব একজন বিবাহিতের বন্ধু। বললুম,—হঃ, কৈরা ফেলা একটা সাদী।

কিন্তন্, বউ যদি ত'র লগে মিলতে না দেয় ? জয়নালের চোখে দুশ্চিন্তা।

ক্যান্ দিব না ?

ঠোঁট উলটে বলল জয়লাল, কি জানি, বউগুলাইনে নাহি দোস্তি ভাঙ্গায়। তার থেইক্কা ভাল আমার সাদী না করণ।

এমন সময় একটা সরগোল ভেসে এল দোলাইগঞ্জ স্টেশনের দিক থেকে। আমরা তাড়াতাড়ি ডিঙ্গি নিয়ে এগিয়ে এলুম।

দেখলুম ছুটো নৌকা হাওয়া কেটে এদিকে আসছে এগিয়ে আর স্টেশনের উপরে খুবই ভিড়। অনেকে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ে সাঁতার কেটে আসছে এদিকে।

এক মুহূর্তে সেদিকে দেখে ও কান পেতে, চকিতে ডিঙ্গির মুখ পূবে ফিরিয়ে শক্ত হাতে দ্রুত বৈঠার চাড় দিল জয়লাল।

আমরা একসঙ্গেই বলে উঠলুম, রায়ট !......

মুহূর্তে আমার বুকের মধ্যে ধ্বক ক'রে উঠল। পূবে হাওয়ার ঝাপটায় কে যেন হিসিয়ে উঠল, মৃত্যু !......মনে পড়ল চকিতে, আমি হিন্দু আর ওই বিলের বুকে যারা ধেয়ে আসছে, মাছ ধরছে, তারা সবাই মুসলমান। এখুনি লগির কয়েক ঘায়ে শেষ ক'রে ঢুকিয়ে দেবে কলমীদামের তলায়।

ফিরে তাকালুম জয়নালের মুখের দিকে। সে মুখ শক্ত, দৃষ্টি নিবদ্ধ আমারই দিকে। কিন্তু কেন ?

ধাঁ করে প্রথমে মনে পড়ল, জয়নাল মুসলমান! আমি যেন দেখলুম, তার ঠোঁটের কোণে ছদ্মবেশী আততায়ীর গোপন হাসি।

ডাকলুম তবু, জয়নাল !......

ডাকলুম, কিন্তু শব্দ বেরুল না গলা দিয়ে।

হাওয়া ঠেলে দোলাইগঞ্জ থেকে ভেসে এল মৃত্যুর আর্তনাদ। এল বন্দে মাতরম্ ও আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি!

সংশয়েব শেষ সীমায় পৌছে আমি প্রায় কেঁদে উঠলুম, জয়নাল, আমি বাড়িতে যামু।

না।

না? চকিতে মনে পড়ল সেই কুমীরের কথা, যে বাঁদরকে খাওয়ার জন্য ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল জলে বেড়াতে। আমার ঘর-বিমুখ মন প্রাণভয়ে হাহাকার করে উঠল বাবা মার কথা মনে ক'রে।

আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম জলে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য।

খেঁকিয়ে উঠল জয়নাল, আরে, করস্ কি?

বাড়ীতে যামু।

পিছে চাইয়া ত্যাখ্।

চেয়ে দেখি, মানুষের ঝাঁক আসছে এদিকে সাঁতার কেটে বিল তোলপাড় ক'রে। আসছে কয়েকটা নৌকা। তারা তো আমাকে ছাড়বে না!

সোঁ করে একটা ঝোপে ছাওয়া নালার মধ্যে ডিঙ্গি ঢুকিয়ে ঘস্ ক'রে থামিয়ে দিল জয়লাল। নৌকা বেঁধে আমার হাত ধরে লাফিয়ে ডাঙায় পড়ে একছুটে এসে সে হাজির হল ওদের বাড়ীতে।

ডাকল, বাপজান!

আইছস্, আইছস্রে বাপজান! বলতে বলতে বেরিয়ে এল তার বাবা মুখ ভরা গোঁফ দাড়ি নিয়ে।

আইছস্, আইছস্, আমার মাণিক! নোলক দুলিয়ে হুঁকো হাতে ছুটে আসে তার মা।

তার বারো বছরের ভাবী ঘোমটা তুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দরজা ধরে। ইতিমধ্যেই শুনেছে তারা দাঙ্গার কথা।

আমার দিকে চেয়ে দেখবার কারুর অবসর নেই। ত্রাসে ফুঁপিয়ে উঠল জয়নালের আম্মা, আমার মজিদ কেমনে আইব গো—।

মজিদ জয়নালের বড় ভাই। সে কাজ করে টিকাটুলির গ্লাস ফ্যাক্টরিতে।

জয়নালের বাবা বলল, আমি একবার ডিঙ্গিখানা লইয়া দেইখ্যা আহি দোলাইগঞ্জে।

না গো বাপজান্‌, হেইখানে বড় কাটাকাটি লাগছে। জয়নাল বলে বাপের হাত ধরে। বাইয়ে কারখানার মধ্যে থাকতে পাব'অনে। আইজ্জের রাইতটা থাউক।

একমুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বলল তার বাবা,—তবে থাউক। কি কও গো মজিদের মা?

যা বোঝ। বলে আম্মা উঠোনেই বসে পড়ে।

দরজা থেকে ঘরের অন্ধকারে মিশে যায় মজিদের বারো বছরের বউ।

তারপর হঠাৎ যেন তাদের সকলের নজরে পড়ে আমাকে। কিন্তু নেই সেই অভ্যর্থনা, স্নেহ-খুশির হাসি।

এ মুসলমান গ্রামের মধ্যে আমি যেন স্বজনহীন, অসহায়, আবদ্ধ হয়েছি শত্রুপুরীতে। আমি পালাতে পারি না, কেঁদে উঠতে পারি না। সংশয়ে যতক্ষণ কাটে, সেটাই যেন আশা।

একবার যেন হেসে উঠতে চাইল জয়নালের বাবা। বলল, জয়নাল, দোস্তরে ত'র ঘরে নিয়া তোল্‌।

কত দিনই একথাটি শুনেছি, কিন্তু আজকের মত এমন বেসুরো বাজেনি। আমার বালক মন বার বার মনে মনে গাইল, বুঝি খুন করার জন্য, বুঝি মজিদের প্রাণের জামিন হিসাবে আমাকে তারা তুলে রাখল ঘরে।

তারপর রাত্রি গেল, দিন গেল, দিন গেল। জ'লো হাওয়ায় ঝড় বয়ে গেল বেতবনের উপর দিয়ে, কলাবাগানে ঢেউ দিয়ে, ছিঁটে বেড়ায় ঝাপটা খেয়ে।

আমি বন্ধ ঘরে, ভয়ে আধখানা হয়ে এক কোণে বসে বসে করছি বুঝি মৃত্যুরই প্রতীক্ষা, হাওয়ায় শুনছি তারই শাসানি।

আজ সকালে দেখি জয়নালকে তার বাপজান কি যেন বলল আমার দিকে ইশারা ক'রে। সেই থেকে ওরা আমাকে শিকল বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

বললুম, জয়নাল শিকল ভ্যাছ্ ক্যান ?

বলল, তুই যদি পালাইয়া যাস্ ?

ওরা আমাকে পালাতেও দিবে না। জয়নাল আমার কাছে এসে বসেও না দুদণ্ড।

তবু ওরা আমাকে খেতে দেয়। কিন্তু কে খাবে ?

আম্মা বলে, খাও মাণিক, হাঙ্গামা থামলে যাইও বাপ মা'র কাছে।

মনে হল ওটা মিঠে গলার ছলনা। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। কিন্তু আড়াল থেকে দেখছি, ওরাও খায় না, শুধু ভাত নিয়েই বসে। দেখছি মজিদের কলাবউ জামতলায় দাঁড়িয়ে, ঘোমটা সরিয়ে ব্যাকুল চোখে কি যেন দেখে পশ্চিম মুখে। দেখছি জয়নালের বাপজানের শরীরটা ফুলে ফুলে ওঠে নামাজে ব'সে।

এ গ্রামের অনেকেই শাক তরকারী বেচতে যায় সূত্রাপুর বাজারে। তারা অনেকেই আসেনি ফিরে, কারুর বা এসেছে মৃত্যুর খবর।

দিনে রাত্রে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে কান্না। কখনো শোনা যায় জেহাদী কোলাহল, আচমকা আকাশ লাল হ'য়ে ওঠে এদিকে ওদিকে।

আমার যেন দিনরাতেরও হিসাব নেই।

প্রায় দিন চারেক বাদে হঠাৎ জয়নাল আমার কাছে এল। উস্‌কোখুসকো চুল, কোল-বসা চোখ, শুকনো মুখ। বলল, মধু, আমি যামু টিকাটুলি ভাইজানের খোঁজে। ফিরা আহি, তারপরে দিয়া আমু বাড়ীতে।

তারপরে হঠাৎ কলসী থেকে মুঠোভ'রে তুলে আনল আমচুর। বলল, নে, খা। তোর মজার আমচুর।

বলে সে বেরিয়ে গেল। আমার মনে হল এ যেন কত যুগের পুরানো কথা। ছুঁড়ে ফেলে দিলুম আমচুর আর হু হু ক'রে আমার চোখ ছাপিয়ে জল এল। আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

তারপর কয়েকদিন বাদে আমি ঘরে থেকেও বুঝলাম, অবস্থা অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু জয়নাল বা মজিদ কেউ-ই আসেনি।

ভাবছি, এমন সময় সবাই চেঁচিয়ে উঠল, আইছে, মজিদ আইছে। ঘর থেকে দেখলুম, একটা ছোট পুঁটলি বগলে মজিদ এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে। সারা মুখে তার গোঁফদাড়ি, বসা চোখে যেন অর্থহীন দৃষ্টি। ঝ'ড়ো হাওয়ায় উড়ছে রুক্ষ চুল।

আইছস্ সোণা, মাণিক, আইছস। বাবা মা জড়িয়ে ধরে মজিদকে।

বারো বছরের কলাবউটি ঘোমটা ঢাকতে ভুলে যায় তার হাসি মুখে।

মণিরে আমার খোদা ফিরাইয়া দিছে। আম্মা বলল, আমাগো জয়নাল আইছে না ?

পুঁটলি থেকে রক্তমাখা জমা আর লুঙ্গি বের করে ফুঁপিয়ে উঠল মজিদ, জয়নালরে মাইরা ফেলাইছে।

ডুকরে উঠল সবাই, মাইরা ফেলাইছে ?

মজিদ বসে প'ড়ে মাটিতে মুখ চেপে হা হা ক'রে কেঁদে উঠল, হ' কারফিউ এলাকা দিয়া যাওনের সময় তারে মিলিটারীতে গুলী কইরা মারছে। আমার কাছে যাওনের সময়!……

কারুর কান্না আমার কানে গেল না। মনে হয় দুরন্ত হাওয়ার ঝাপটাই যেন দুনিয়াকে উল্টে দেবে।

মেঝেতে তখনো ছড়িয়েছিল আমার ছুঁড়ে ফেলা আমচুর, জয়নাল দিয়েছিল।

আমাকে ফিরিয়ে দিতে চলেছে জয়নালের বাপজান ডিঙ্গিতে করে।

আজ বিল শান্ত। থেকে থেকে হঠাৎ হাওয়ায় শিউরে উঠেছে কলমীদাম আর শাপ্‌লা ফুল, টলটলে জলে লুকোচুরি খেলছে ট্যাংরাপুঁটি, স্তব্ধ পাটক্ষেত। পাখী একটা ডাকছে, ওহো……ওহো ……সে শব্দ মিশে যাচ্ছে শূন্য আকাশের বুকে।

সন্দেহে প্রাণের ভয়ে আমি কারুকে ছোট করেছি কি না করেছি,

কি ভাল কি মন্দ, সে বিচারের অবসর ছিল না আমার মনে। কেবল থেকে থেকে কুড়িয়ে আনা সেই আমচুর ভরা মুঠো বুকে চেপে, আমার বালকের বোবা মন গুমরে গুমরে উঠল আর খালি মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, জয়নাল······জয়নাল!

বাপজান শুধু বলল, কাইন্দ নারে সোণা!······

নাই নাই আর নাই।

ক্লান্ত বাদশা' হুঁকোটি হাতে নিয়ে তিনটি কথা জিজ্ঞেস করেছে, আর তিনটি জবাব দিয়েছে জোবেদা—নাই।

চার ক্রোশ পথ হেঁটে এসে, হাত পা' না ধুয়ে শুষ্ক কণ্ঠনালীটিকে একটু ভিজিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়েছে—তাই একেবারে সোজা পায়ের ধূলোমাটি নিয়ে দাওয়ায় উঠে এসে হুঁকো নিয়ে বসেছে সে। তামাকের ডিবা হাত্ড়ে তামাক না পেয়ে জিজ্ঞেস করেছে, তামুক নাই ?

অপরাধীর মত জবাব দিয়েছে জোবেদা—নাই।

—পাতা আছে ?

—নাই।

—রাব ?

—নাই।

নাই! ক্লান্ত মস্তিষ্কটায় এই নাই বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে অকস্মাৎ প্রচণ্ড ক্রোধে যেন চৌচির হয়ে গেল। দপ্ ক'রে আগুন জ্বলে উঠল যেন সারাটা গায়ে। ঠাস্ ক'রে হুঁকোটাকে দাওয়ায় আছড়ে ভেঙে ফেলল সে। খোলের পীতাভ জল গড়িয়ে পড়ল দাওয়া থেকে উঠানে।

—নাই! ভীষণ ক্রোধে নিজেকে সে নিজেই যেন শাসিয়ে গর্জে উঠল। ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে শিকা'র উপর থেকে হাঁড়ি কলসী যা পেল—ক্ষ্যাপা পাগলের মত ভেঙে দিল তছ্নছ্ করে। ঠাস্ ঠাস্ ক'রে। নিজের গালে মুখে ঘুষিয়ে চড়িয়ে হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঘুরে কঁ্যাৎ করে একটা লাথি কষিয়ে দিল জোবেদার পাঁজরে।

—কি ভ্যাখস্ তুই হারামজাদি ? চাইয়া চাইয়া ভ্যাখস্ কি ? বাইর হ, বাইর হইয়া যা' আমার সামনের থেইক্যা !

এমনিতেই বাদশার উগ্র মতি গতি দেখে জোবেদা আতঙ্কে থর্ থর্ ক'রে কাঁপছিল। তারপর হঠাৎ লাথিটা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল চৌকাঠের উপর।

এমন সময় বাদশা'র ছেলে মঙ্গল খেলে ফিরে বাড়ীতে ঢুকে ব্যাপার দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মনে হ'ল বাদশা' বুঝি তার উপরও ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তা' না করে সে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। দেখতে পেয়ে জোবেদা নতুন আতঙ্কে আবার ডুকরে উঠল, ও মঙ্গল, ভ্যাখ মা'নুডা যায় কুন্‌ঠাঁই। নিজের পরানডারে না শেষ করে।

না, প্রাণ দেওয়ার কথা মনে আসেনি বাদশা'র। সে জনশূন্য পীরের দরগার পিছনে প্রকাণ্ড হিজল গাছটার প্রশস্ত শিকড়টার উপর ভেঙে পড়ল !—হায় খোদা !

তামাক বা তামাকের পাতা নেই, শুধু এই কারণেই বাদশা' আজ এমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেনি। তার আজ কিছু নেই, রিক্ত ক'রে দিয়েছে একেবারে—সমস্ত বুকটাকে খালি ক'রে দিয়েছে।

গাঙের ধারে বিঘা চারেক যে ঢালু জমিটুকু তার সারা বুক জুড়ে যুগিয়ে রেখেছিল এত আশা উৎসাহ, সেটুকু আকণ্ঠ দেনার দায়ে হাতছাড়া হয়ে গেছে। কেউ কোনদিন ভাবতে পারেনি ওই জমিতে বাদশা' চাষ করতে পারবে। ঢালু জমির উপর লাঙ্গল নিয়ে উঠানামা করা সে বড় চারটিখানি কথা নয়, আর বলদ সে বলদই, মেশিন নয় যে লেজ মোচড়ালেই সে ঢালু জমির বুক চিরে লাঙ্গল নিয়ে ওঠানামা করবে।

তবে বাদশা' হল খাটিয়ে জোয়ান মরদ। চার সাল আগে বিষম জ্বর থেকে আরোগ্যলাভের পর—সাক্ষাৎ হজরৎ-পীর খালি-কুজ্জমানের স্বপ্নে-পাওয়া মাদুলী আজও আছে তার চওড়া গর্দানটায়

বাঁধা—সেই যে এসেছিল স্বাস্থ্যের জোয়ার আজও সেই জোয়ারে ভাটা পড়েনি। মাদুলিধোয়া জল খেয়ে একটা প্রচণ্ড গোঁ ধরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই পাহাড়ের মত ঢালু জমির বুকে। এই উপেক্ষিত ঢালু ঘাসবনের বুকে সে ফুটিয়ে তুলবে বেহেস্তের সৌন্দর্য, সমতল ভূমির সমস্ত গরিমাকে আত্মসাৎ করবে সবুজ সমুদ্রের ঢেউ তুলে।

তুলেছিল, সবুজ সমুদ্রের ঢেউ উঠেছিল সেই ঢালু জমির বুকে। সমতলভূমির আয়েসী অহঙ্কারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল সে।

কিন্তু তখন তার বড় ভাই সোলেমান হতাশায় ভয়ে চলে গিয়েছিল—শহরে। কারখানায় কাজ করতে। সে ভয় পেয়েছিল, অনাহার দুর্দশার, ঢালু আগাছাভরা জমি আশার বদলে দুরাশাই এনে দিয়েছিল বেশী। নিজের বিবিকে শুদ্ধ সে নিয়ে গিয়েছিল, বাদশা'র ভাবী-সাহেবাকে।

বাদশা যায়নি। সে হল চাষী, যাকে বলে খাঁটী চাষী। স্বাধীন গ্রামিন্ আভিজাত্য ছিল তার মনে। গোলামীকে সে ঘৃণা করে। কারখানায় কাজ করতে যাওয়াকে সে মনে করে অপমান। ভীরু সোলোমান তাই যে জমি দেখে ভয় পেয়েছিল, হতাশায় চলে গিয়েছিল কারখানায় কাজ করতে, বাদশা সেই জমিতেই রক্তের বিনিময়ে ফলিয়েছিল সোনা।

বাদশা'র পীড়াপীড়িতে সোলেমান একবার এসেছিল ছোট ভাইয়ের কেরামতি হিম্মৎ দেখতে। হাঁ, তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিল তাকে বাদশা। বাদশা'র প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধায়, সম্মানে—নিজেকে তার বড় দুর্বল, লজ্জিত মনে হয়েছিল, সে যেন বাদশা'র ছোট ভাই।

কিন্তু সোলেমানও খুব দুঃখে ছিল না। টাকার মুখ তো দেখেছে সে, খাওয়া পরারও অভাব ছিল না খুব। বাদশা'হ অবশ্য একটু বিস্মিত হয়েছিল ভাইসাহেবের ভদ্রলোকি পোশাক আর মেজাজ

দেখে। তবে তার মধ্যে শ্রদ্ধা ছিল না, ছিল একটা চাষাড়ে বিস্ময়। সেই বিস্ময়টুকুও শেষ পর্যন্ত বক্র হাসির পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল। গোলামির আভিজাত্য!

কিন্তু ইতিমধ্যে দেনার ছোট গর্তটা সুদে আসলে ভিতরে ভিতরে কত দিকে যে ছড়িয়ে পড়েছিল এটা সে টের পায়নি। টের পেল আজ সকালে যখন জোতদার মামুদ মিয়া তাকে ডেকে বলল, ওই ঢালু জমিটাও তার খাসে চলে গেল। নতুন উৎসাহে নতুন বলদ কিনেছিল তখন বাদশা দেনা ক'রে। বীজ ধান নিয়েছে কয়েকটা সাল। সব মিলে সুদে আসলে যা' দাঁড়িয়েছে বাদশা'কে ভিটেটুকু পর্যন্ত বাঁধা দিতে হবে শেষ।

সকালবেলা একথা শুনে সে গিয়েছিল জোতদার মহিন্ ঠাকুরের কাছে। ভাগে চাষ করবে সে মহিন্ঠাকুরের জমিতে। মামুদের জমিতেও সে ভাগে কাজ করতে পারত, কিন্তু মামুদের প্রতি একটা বিজাতীয় ক্রোধে সে তার কাছে যায়নি। মামুদ তাকে একটু খাতির অবধি করেনি। স্পষ্টভাবে সোজা জানিয়ে দিয়েছে, ওই জমিটাতে আর নাঙ্গল ঢুকাইও না বাদশা'। তোমার কর্জর বহর বড় বেশী। বলদ দুইটা লইয়া আইস, কিস্তি শোধের টাহাটা লেইখা লইমু। টিপসই দিয়া যাইও। আর এই বছরডা গেলে তোমার বাপের ভিডাও আমার খাসে আইব!

একটু চুপ করে থেকে পরমুহূর্তেই পরম গাম্ভীর্যে সে বলেছে, আমার ক্ষেতমজুররা থাকব হেই ভিডায়। ইচ্ছা করলে তুমিও থাকতে পার, বিবি ছাওয়াল লইয়া একলাই থাকতে পার। বাপের ভিডা আর ছাড়তে হয় না।

অর্থাৎ মামুদের ক্ষেত-মজুর হবে বাদশা'।

ভাইবা দেহি—এই বলে সোজা সে চলে গিয়েছিল হাটে মহিন্-ঠাকুরের কাছে। কিন্তু সেখানকার একটা বিরাট রহস্য—ভাগে দিলে না জমি মহিন্ঠাকুর। কারণ কিছু বললে না, শুধু উপদেশ দিয়ে

দিলে বাদশা'কে, মামুদের কাছে যাও, সে জমি ভাগে দিবে। তোমাদের জাতের লোক, বড় মানুষ, তার কাছে যাও।

সেই থেকে তার শূন্য বুকটা হাহাকার করছে, নাই, নাই, কিছু নাই। আর সেই নাইয়ের প্রতিধ্বনিটা যখন এল জোবেদার কাছ থেকে তখন তার বোবা লক্ষ্যহীন আক্রোশটা ফেটে পড়ল এমন ভয়ঙ্করভাবে।

বাদশা' মুখ তুলল, দৃষ্টিটা তুলে ধরল দিগন্তবিসারী তেপান্তরে।

নিস্তব্ধ গোধূলি। পথে প্রান্তরে মানুষের সাড়া প্রায় নেই বললেই চলে। আমনের কাজ শুরু করবার সময় হয়েছে। কিন্তু কাজ আরম্ভ হয়নি এখনো, তাই তেপান্তর জুড়ে মানুষ চোখে পড়ে না একটাও। সারা মাঠই প্রায় মামুদের খাস। সে হুকুম না দিলে, বীজধান না দিলে কাজ শুরু হবে না। সেই অপেক্ষাতেই আছে সবাই।

তেপান্তর জুড়ে চোখে পড়ে শুধু রিক্ত মাঠ। খোঁচা খোঁচা আউস ফসলের অবশিষ্টাংশ ছুঁচের মত আকাশমুখী হয়ে আছে। খাপছাড়াভাবে এখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে আগাছা। জলো ঘাস আর কাশবনের ঘন আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ছে তেপান্তরের বুক জুড়ে।

গুচ্ছ গুচ্ছ দীর্ঘ শাদা কাশফুল ফুটেছে, মাথা হেলিয়ে দুলছে হাওয়ায়। বাদশা'র মনে হয় সন্ধ্যার ধূসর আলোয় জোবেদার মত শত শত মেয়ে, এই গাঁয়ের মেয়েরা শাদা বোরখা পরে—রিক্ত মাঠ জুড়ে মাথা নেড়ে চলেছে—নাই নাই নাই! মনে হয় নমশূদ্রদের ঝিউড়ি বউড়িরা মাথায় ঘোমটা টেনে তেপান্তর জুড়ে সারি সারি মাথা দুলিয়ে চলেছে—নাই নাই নাই। কাশ আর জলো ঘাসবনের এই বিস্তৃত সমারোহ কি মামুদের চোখে পড়ে না!

হঠাৎ চমকে উঠল বাদশা' সামনের উই পোকার বিরাট ঢিবির পিছনে মানুষের একটা মাথা দেখে। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ়

হয়ে আসছে। কেমন ছম্ ছম্ করে উঠল বাদশা'র গা'টা।—কেডা ওইখানে? উঠে দাঁড়াল সে।

টিবির পিছন থেকে উঁকি মারে মঙ্গলের ভীত অপরাধী মুখটা।

—কেডা, মঙ্গল নি?

—হ।

ছাওয়ালটার ভীত সন্ত্রস্ত কচি মুখখানি দেখে অবোধ-বেদনায় টনটনিয়ে উঠে বাদশার বুকটা। আফ্‌সোসে মনটা পুড়তে থাকে। কিছুক্ষণ আগের চণ্ডালিপনার কথা মনে হতেই তার অন্তরাত্মা যেন ফুঁপিয়ে উঠতে চাইল। তার ছাওয়ালের মা মাগীটার পাঁজরটাকে ভেঙে দিয়েছে। বুকটা ভেঙে গেছে ছাওয়ালটার। বাপজান নয়, বাঘা কুত্তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ভীরু শেয়ালের বাচ্চা। হায় বাদশা'র কিসমৎ, হায় বিবি ছাওয়ালের তক্‌দির্।

—কাছে আয় মঙ্গল!—গলা শুনে মনে হয় সত্যিই বুঝি ফুঁপিয়ে উঠবে সে।

মঙ্গল শঙ্কিত মুরগীর বাচ্চার মত পা ফেলে কাছে আসে। একটু হেসে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে বাদশা বুকের কাছে তাকে টেনে নিয়ে বলে: এমুন বাহাইরা জামাডা তরে কে দিছে রে মঙ্গল?

বাপজানের এ স্মৃতিহীনতা আর হাসি দেখে একটু সাহস পায় মঙ্গল। বলে, তোমার মনে নাই, বড় চাচী গেল ঈদে পাঠাইয়া দিছিল আমারে?

মনে পড়ে বাদশার সোলেমানের বিবি—তার ভাবীসাহেবার কথা। শহরে গিয়ে সরমের মাথা খেয়েছে সে। বোরখার বালাই প্রায় ত্যাগ করেছে সোলেমানের বিবি। চাষী বউয়ের মত আর ঘোমটা টেনে কথা বলে না। দ্বিধাবোধ করে না একটা পর-পুরুষের কথার জবাব দিতে। বড় বেহায়া তার ভাবীসাহেবা, খানদানের মাথা সে নীচু ক'রে দিয়েছে। কথা বলে হেসে ঢুলে—হড়বড় করে। কেমন একটা অপরিচয়ের গণ্ডী যেন খাড়া হয়ে ওঠে বাদশার চোখে। অচেনা মনে

হয় ভাবীসাহেবাকে—তার চলন বলনকে। মনে পড়ে কাজীর পাঁচালী :
"দাঁত ভ্যাখাইয়া হাসে নারী ভুপভুপাইয়া চলে'—

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে জোবেদার কথা। সরমে ভরপুর। বাদশার উঠানের রোদটুকু ছাড়া যার গায়ে আর রোদ লাগে না, ছ্যাঁচা বেড়ার সঙ্কীর্ণ ফুটো দিয়ে যে পর্যবেক্ষণ করে বাইরের বিরাট পৃথিবীকে।

তবে বেহায়া হলেও ভাবীসাহেবা বড়ই স্নেহশীলা। ভালবাসে সে সবাইকে। দিলটা বেশ খোলসা। বাদশা' আর জোবেদাকে সে দেখে ভাই-বহিনের মত। হিংসা নেই মানুষটার। মঙ্গলের তো কথাই নেই। আবাগীর ছাওয়াল নেই, মঙ্গলকেই সে নিজের ছাওয়ালের মত দেখে। যখনকার যে, খাবার থেকে শুরু করে—জামা, টুপি, মায় জুতোটি পর্যন্ত, মঙ্গলের জন্য বারোমাস পাঠাবে। মঙ্গলের ব্যামো হলে উপোস দিয়ে পড়ে থাকে সেখানে। সোলেমান তখন ঘনঘন চিঠি লেখে ; তোমার ভাবীসাহেবা ভাত পানি ত্যাজিয়াছে—।

এই মুহূর্তে খুব খারাপ মনে হয় না ভাইসাহেবের জীবনটা বাদশা'র কাছে। তার মত এমন এক মুহূর্তে রিক্ত হয়ে যাবার ভয় নেই সোলেমানের। মনে পড়ে সেই মোটা—আসমান ছোঁয়া চিমনিটা—মুখ থেকে অনর্গল ধোঁয়া বেরোয়—কালো জমাট ধোঁয়া। তার নীচে সেই বিরাট ঘরটায় কাজ করে তার ভাইসাহেব। হপ্তায় হপ্তায় টাকা নিয়ে আসে—নিয়ে এসে দেয় ভাবীসাহেবার হাতে। অভাব নেই ছোট্ট সংসারটায়। আসে খায়, খায় আসে।

তার চিন্তায় বাধা দিয়ে ডাকল মঙ্গল ; আম্মা বড় কানতে লইছে, বাড়ীতে চল বাপজান্।

—হ, চল্! একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে বাদশার। চলতে চলতে হঠাৎ বলে সে,—তর্ বড় চাচীর কাছে যাবি রে মঙ্গল্?

মঙ্গল বিস্মিত হয়। নানান্ ঘটনা ও কথার মধ্যে দিয়ে সেও জানত বড় চাচা-চাচীর উপর বাপজানের বড় গোসা। তাই উল্লসিত জবাব

একটা থাকলেও হঠাৎ কিছু বলতে পারল না সে, সন্ধ্যার অন্ধকারে বাপজানের চিন্তান্বিত মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল।

নিস্তব্ধ বাড়ীটার বেড়া ঠেলে ঢুকে দাওয়ায় উঠে বসল বাদশা'। মঙ্গল ভিতরে গেল তার আম্মার কাছে। ফেলাছড়া জিনিসগুলো চোখে পড়ে না একটাও। যেমন লেপা-পোঁছা তেমনি। অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে অন্ধকার দাওয়ায় একলা চুপ করে বসেই থাকে সে।

একটু পরে মঙ্গল এসে একটা হুঁকা বাড়িয়ে ধরে বাপজানের সামনে। হুঁকার ডগার টাট্‌কা তামাক ভরা ধূমায়িত কল্‌কে। ঘরের দরজার আড়ালে কাঁচের চুড়ির ঠুন্ ঠুন্ শব্দ আসে তার কানে।

ব্যথিত লজ্জিত বাদশা হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিল। অন্যমনস্কের মত দু'একটা টান দিয়ে, একটু কেশে ডাকল,—মঙ্গলের মা আছনি ?

শান্ত জবাব আসে দরজার আড়াল থেকে—জী।

—একটু এদিকে আইও।

জোবেদা এসে দাঁড়াল অন্ধকার দাওয়ার একপাশে একটু দূরে। মুখ দেখা যায় না। শুধু তার হাতের কাচের চুড়িগুলো সামান্য জ্বল্ জ্বল্ করে। সেদিকে না চেয়ে বাদশা' বলে, গাঙ্গ কিনারের জমিডা —মামুদ ছাইড়ল না।

জীবনে এই প্রথম বাদশা' বিবির কাছে সংসারিক আলোচনা করতে বসল। দুনিয়ার সমস্ত ভাবনা মরদের ; মাগীরা রাঁধবে, বিয়োবে, মরদের পরিচর্যা করবে, এটাই সে চিরকাল ভেবে এসেছে। বললে ; —উপায় না দেইখা গেছিলাম মহিন্-ঠাকুরের কাছে। কিন্তুক ভাগে দিব না হেই জমি।

জোবেদা স্তব্ধ, নিরুত্তর। দু'একটা জোনাকি জ্বলে উঠেছে বাইরে অন্ধকারের বুকে। —এই ভিটায় আর বেশীদিন নাই, বোঝলানি মঙ্গলের মা ? মুখ তুলে তাকাল সে জোবেদার ঝাপসা মুখের দিকে।

তারপর খানিকক্ষণ ঘন ঘন হুঁকোয় টান দেওয়ার পর হঠাৎ সে বলে, সরম কম বটে, তবু ভাবীসাহেবা আমাগোরে খুবই পেয়ার

করে। কোন পরব বাদ যায় না; তোমার লেইগা শাড়ী—মঙ্গলের জামা—কত কি দেয়। মঙ্গল তো তার নিজের ছাওয়ালের লাহান—না?

জোবেদার কাছ থেকে অস্ফুট একটা শব্দ আসে—হাঁ।

—ভাই সাহেবও তাই। মানু'ডা খুবই ভাল। পোড়া পেটের লেইগা মানু'তে কিনা করে, ভাই সাহেব তো কারখানায় কাম করে। খাইটা খায়। তা ছাড়া, সুখেই আছে তারা। অষ্ট পহর অভাব নাই।...

একটু চুপ করে থেকে হুঁকোটা রেখে হঠাৎ বেশ জোর দিয়েই বলে সে,—আমিও ভাইসাহেবের কাছে যামু, কাম করুম কারখানায়, হ! গুমোট ধোঁয়ায় যেন আটকে এল তার গলা।

—না না। এতক্ষণে প্রায় চাপা আর্তনাদ করে উঠল জোবেদা। —আপনে পারবেন না কারখানায় কাম করতে।

—পারমু। বাধা দিয়ে বলে ওঠে বাদশা'।

মানুষটা আজ একি কথা বলছে! জোবেদা তবু বলে;—হেই ড্যাকরাডার (মামুদের) কাছেই যান। তার কাছে—

—না। আবার রুক্ষ হয়ে ওঠে বাদশা'র স্বর। দুঃখু নাই, চিন্তা নাই, আনে খায়, আমিও ভাইসাহেবের মত রোজগার করুম। ঝঞ্ঝাটের কাম কি? বাপ মায়ের মত ভাই ভাবী সাহেব, তাগো কাছেই যামু। ইজ্জৎ বাঁচাব, বোঝলা তোমারও ইজ্জৎ বাঁচব। মঙ্গলডা দুইটা ভাল খাইতে পাইব।

নির্বাপিত হুঁকাটা তুলে নিল সে আবার। পাতালপুরী থেকে যেন অন্ধকার পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে বাদশা'র গলা, তুমি বোঝনা মঙ্গলের মা,—ক্ষেত মজুর আর ক্যাঙ্গালীতে তফাৎটা কি? মামুদের ক্ষেত মজুর, বিলাই কুত্তার লাহান, জোতদারের পায়ের তলায় পইড়া বারমাস রোজা পালুম! ভিডা নাই, জমি নাই, বিলাই কুত্তা না তো কি? না না না, তার থেইকা ভাইসাহেবের মত রোজগার ভাল!

হুঁকো রেখে জোবেদার কাছে এসে দাঁড়ায় সে। আজই রাইত বিহনে বাইর হমু। জাহাজ ছাড়তে হেই বেলা একডা, শেষ রাইতে বাইর হইলে বেলা বারোটা লাগাৎ ঘাটে পৌছামু, বোঝলা?

জোবেদার গলা দিয়ে কথা ফোটে না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল সে।

বাদশা' নেমে গোয়ালের দরজাটা খোলে।—কইরে সোরাব, রুস্তম! বলদ দুটোর নাম রেখেছিল সে সোরাব-রুস্তম। তেজী বলদ, ঢালু জমির বুক চষেছিল ওরা। জমিদার বাড়ীর জোয়ান ঘোড়ার মত প্রকাণ্ড বলদ, ওপারের হাট থেকে কিনে নিয়ে এসেছিল পছন্দ করে। লড়ায়ে চেহারা দেখে সে ওই নাম রেখেছিল। মঙ্গলের ইতিহাস বইয়ে সেই দুই বীরের নাম শুনেছিল সে, বাপ ব্যাটার বীরত্বের কাহিনী। সেই মরদ দুটোর নামের পিছনে যে রোমান্স ছিল, সেই রোমান্স তার জেগে উঠেছিল এই তেজী বলদ দুটোকে দেখে।

সোরাব-রুস্তম বেরিয়ে এল।

—চলরে। দিয়া আহি ত'গো কসাইডার কাছে, ত'গো নসিব বান্দা তার হাতে!

জোবেদা লম্ফটা নিয়ে এসে দাঁড়াল। নির্বোধ বলদ দুটো চারটে ডাগর চোখ তুলে ধরল মনিবের দিকে। ভাবল বোধ হয়—রাত্রে অন্ধকারে গোয়ালের বাইরে, জীবনে তাদের এ ব্যতিক্রম কেন?

—দিয়া আহি মঙ্গলের মা! চলুরে! অন্ধকারে বলদ দুটোকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বাদশা'।

সারা রাত ধরে এটা সেটা নানান টুকিটাকি বস্তা বের করেছে জোবেদা। সমস্ত বেঁধে ছেঁদে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছে সে। হঠাৎ লাথির আঘাত খাওয়া পাঁজরটায় মৃদু স্পর্শে চমকে জেগে উঠল সে।

—কেডা?

—আমি, বাদশা'র নরম গলা কেঁপে উঠল একটু। সময় হইল মঙ্গলের মা। উঠ, বাইর হইতে হইব।

মঙ্গলের গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিল সে। ওঠ্‌রে মঙ্গল ওঠ ওঠ।

গোটা তিনেক বোঁচকা, একটা মাদুর আর একটা হ্যারিকেন। বাদশা'র সংসার।

বাদশা' বলে,—বোরখাটা অখন থাউক। রাইত পোহাইলে রাস্তায় পইরা লইও। বলে সে একটা বোঁচকা মাথায় আর একটা হাতে নেয়। বগলে নেয়, মাদুরটা। আর একটা বোঁচকা ওঠে জোবেদার কাখে। হ্যারিকেনটা নেয় মঙ্গল।

দরজার শিকল তুলে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই জোবেদার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল চোখ ছাপানো জলে।

বাদশা'র ঠোঁট দুটো থর্‌ থর্‌ করে কেঁপে উঠল উঠানে দাঁড়িয়ে।

মনে মনে বলল সে, আবার আইমু। কারখানার খাটুনির পয়সা দিয়া আবার ভিডা ছাড়ামু, জমি ছাড়ামু, আমার গাঙ্গ কিনারের জমিডা।

বাইরে তখনো অন্ধকার। আসন্ন শরৎকালের মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আকাশে শুকতারাটা জ্বলছে দপ্‌ দপ্‌ করে। তিনটি মানুষের ছোট একটি দল ছায়ার মত এগিয়ে চলল—বর্ষার জলে ডোবা সর্পিল পথের উপর দিয়ে। গাঙ্গের কিনার দিয়ে নরম ঢালু জমির বুকে পায়ের গভীর ছাপ রেখে ছায়া তিনটি এগিয়ে চলল জাহাজঘাটের দিকে। আগে বাদশা', তারপর মঙ্গল, পিছনে জোবেদা।

একটুকু পা চালাইয়া আইও গো মঙ্গলের মা। জাহাজ না ফেল হয়। আঁধার শেষ হওয়ার আগেই পরিচিত তল্লাট ছাড়িয়ে যেতে চায় বাদশা'।

বেলা বারোটার আগেই তারা পৌঁছয় জাহাজঘাটে। ইতিমধ্যে পথে জোবেদার গায়ে বোরখা উঠেছে। গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠেছে সে।

টিকিট ঘরের একটু দূরে নিরালা জায়গায় বোঁচকা নামিয়ে বসে তারা। বাদশা' টিকিট আর জাহাজের খবর নিতে যায়।

একটা পুরনো মালসা আর চিঁড়ে বের করল জোবেদা বোঁচকা খুলে। মঙ্গলের ক্ষিদে পেয়েছে, ওই মানুষটারই কি আর কম ক্ষিদেটা পেয়েছে! মালসায় চিঁড়ে ঢালতে ঢালতে মুখের ঢাকনাটা খুলে সে বাদশা'র দিকে দেখে। পা টেনে টেনে চলেছে বাদশা'।

—মঙ্গল ঘটিতে কইরা খানিক পানি লইয়া আয় তো বাপ্। মঙ্গলের দিকে একটা ঘটি বাড়িয়ে দিল জোবেদা।

খানিকক্ষণ বাদে বাদশা' ফিরে এল। হাত' পা' ছড়িয়ে বসে পড়ে বলল, আর বেশী দেরী নাই মঙ্গলের মা, ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই নাকি জাহাজ ভিড়ব।

মঙ্গল জল নিয়ে আসতে সবাই শুকনো চিঁড়ে আর গুড় নিয়ে বসে খেতে। জোবেদা বাদশা'কে আড়াল করে নদীর দিকে মুখ করে বসে।

নদীতে অসংখ্য জেলেদের নৌকা ঘুরছে। কোনটার পাল গুটনো, কোনটার ছাড়া। ইলিশ মাছের মরশুম এটা। তাই নৌকাগুলি জাহাজঘাট আর ওপারের কালো একটা রেখার মত ধূ ধূ করা বহু বিস্তৃত চালার দিকে যাতায়াত করছে।

জলো হাওয়া এলোমেলো হয়ে ঘুরে বেড়ায় বালুমাটির উপর দিয়ে। সেই হাওয়ার গায়ে পাখা ঝাপটা দেয় ওই নৌকাগুলোর মত অসংখ্য গাঙচিল।

জোবেদার বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে উথালি পাথালি করে ওঠে ওই গাঙের বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলোর মত। মনটা এলোমেলো হয়ে যায়, এলোমেলো হাওয়ায়। চোয়াল দুটো আনমনে নাড়তে নাড়তে এক সময় হঠাৎ চমকে উঠল সে একটা শব্দ শুনে।

—আইতেছে। বাদশা' উঠে দাঁড়াল। জাহাজ আইতেছে গো মঙ্গলের মা। হু—ই যে, বাঁশী শোনা যায়। লও, লও সব বাইন্দা ছাইন্দা লও।

খোলা বোঁচকাটা আবার বাঁধতে আরম্ভ করে জোবেদা। মঙ্গলও কপালে হাত দিয়ে দূরের দিকে তাকায়। হ, কি যেন একটা আসছে বড় গাঙের ঢেউ কেটে কেটে।

এতক্ষণে যাত্রীতে ভরে উঠেছে জাহাজঘাটের বালুময় প্রাঙ্গণ। বাক্স বোঁচকায় ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি। দু'একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয় বাদশা'র। জিজ্ঞেস করে, কুনঠাঁই গো বাদশা' মিয়া।

—ভাই সাহেবের কাছে। আর বেশী কিছু বলে না সে। দুঃখ ঘুচুক, পয়সা কড়ি হোক, ভিটা জমি খালাস হোক, তারপর সে অনেক কথা বলবে সবাইকে। সুখের সময় অতীত দুঃখের কথা বলতে ভাল লাগে।

জাহাজ এসে ভিড়ল। ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই।

বাদশা' বোঁচকা তুলে নিল মাথায়, হাতে। জোবেদাও নিল।

—ও মঙ্গল, বাদশা' ডাকে। তুই একটা হাত ধর আমার, আর তর মায়ের আঁচলটা ধর এক হাতে। ছাড়িস্ না য্যান। আমার লাগৎ আইও গো মঙ্গলের মা।'……

আহঃ! দু' এক পা এগোতেই পেছন থেকে ডাক পড়ে, অ' বাদশা' মিয়া!

—কেডা?—না ফিরেই বাদশা' বিলম্বিত কণ্ঠে হাঁকে।

জবাব দেয় মঙ্গল—আমাগো পিয়ন চাচা!

—আইতে ক' তারে।

—আইতেছে।

পিয়ন কাছে এল। জিজ্ঞেস করল, কই চললা?

—শহরে, ভাইজানের কাছে।

—অ! কাইলের ডাক আইতে বড় দেরী হইছে, তাই যাই নাই। আইজ্ যাইতে ছিলাম তোমা'গো ওদিকেই, খানকয়েক চিঠি আছে, লইয়া যাও। একটা পোষ্টকার্ড বাড়িয়ে ধরে সে বাদশা'র দিকে।

হ? মনটা অস্বস্তিতে ভরে ওটে বাদশা'র। বলে, অখন আর সময় নাই। একটুক্ তাড়াতাড়ি পইড়া দেও তো ভাই—কি লেখছে?

জোবেদা বোরখার আড়ালে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

পিয়ন পড়ে, লেখতেছে তোমার ভাইসাহেব সোলমান, বোঝলানি? লেখছে ঃ—দোয়াবরেষু, বহুৎ বহুৎ দোয়া পর আশা করি খোদার কৃপায় মঙ্গলেই আছ। খুবই দুঃখের কথাটা জানাইতেছি আমার চাকরীটা নাই। কারখানার চারশত লোক বরখাস্ত কইরাছে। আমিও তাহার মধ্যে আছি। আগামী পরশ্ব তোমার ভাবীসাহেবারে লইয়া বাড়ী রওনা হইতেছি। তোমার বিবি ও মঙ্গল…

স্বপ্নোত্থিতের মত তিনটি মানুষ যাত্রীর ভীড় চীৎকারের মধ্যে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটা বিরাট কালো জাল যেন নেমে এল চোখের উপর। কারখানায় সেই ধোঁয়া উদ্গীরণকারী কালো চিমনিটা আর গঙ্গা কিনারের ঢালু জমিটা একাকার হয়ে একটা প্রচণ্ড শব্দে আর অভিনব দৃশ্যে মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। চাপা সমুদ্রের গর্জনের মত যাত্রীর চীৎকার আর সে শব্দে দিশেহারা নির্বাক নিস্পন্দ তিনটি মানুষ!

ঠিক যে মুহূর্তে সংবাদটি এল, 'উনি' এসেছেন, সেই মুহূর্তেই গোটা কারখানায় একটা ম্যাজিক ঘটে গেল। সেক্‌শনে কেরাণীদের নিঃশব্দ কিন্তু দ্রুত ছুটোছুটি শুরু হ'য়ে গেল। যেন একটা ভয়ংকর আতংক-জনক কোন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এবং ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত গোপনীয় কিছু। তাই সকলের চোখে মুখেই একটি চাপা উৎকণ্ঠা। কেউ গলা খুলে কথা পর্যন্ত বলছে না। সবাই ফিস্‌ফিস করছে, কানে কানে কথা বলছে।

একমাত্র রাজার মৃত্যু আসন্ন হলেই, রাজপ্রাসাদে এমনি একটি আতংক এবং ফিসফিসানি চারদিকে চলতে পারে। কেন না, সেখানে মৃত্যুই শুধু নয়, সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্রটাও চলতে থাকে শোক-বিহ্বলতার মধ্যে।

কিন্তু এখানে রাজার মৃত্যু নয়, রাজপ্রাসাদও নয় এটা।

এটা কারখানা। তাও কোন এঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরী নয়, চটকল।

সেখানেই এরকম একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটছে।

সেকশনে সেকশনে অফিসে অফিসে, মজুর, কেরাণী ওভারসিয়ার, লেবার অফিসার, সকলের কাছে সংবাদ চলে গিয়েছে, 'উনি' এসেছেন।

যদিও গতকালের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শ্রমিকেরা সকলেই ফর্সা জামা কাপড় পরে আসতে পারেনি, কেরাণীরা সকলেই টিপটপ হ'তে পারেনি, ওভারশিয়াররা এবং অফিসাররা পর্যন্ত 'চয়েস্‌' অনুযায়ী টাইয়ের রং ফলাতে পারেনি, তবু সকলেই স্মার্ট, দক্ষকর্মী হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

শ্রমিকদের অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে এনে কোন লাভ নেই। লোকগুলি চিরদিনই 'ক্যালাস্'। আর ঠোঁট উল্টে উল্টে 'ওঁর' সম্পর্কে দু'চারটে বাজে কথা বলবেই। যদিও মেসিন থেকে তারা কেউই নড়ছে না। ম্যানেজার, অফিসার, ওভারশিয়ারের কথানুযায়ী খুব মনোযোগ দিয়েই কাজ করে চলেছে। তারাও জানে, 'উনি' এসেছেন। আর 'উনি' খোদ মালিক, খোদ কলকাতার খোদ আলুগুদাম অর্থাৎ হেড অফিস থেকে আসছেন। আর কাজ মানেই যে-হেতু ইজ্জতের ব্যাপার, সেইজন্য কোন সময়েই সেটা হারাতে তারা রাজী নয়। অবশ্য, একথা সত্যি, সাধারণ দিনে কাজ কর্মে কিছু শৈথিল্য তাদের থাকে। কেন না, তাদের ওপর ওভারশিয়ার দারোগার মত নজর রাখে। যেন তারা চোর, কাজ চুরি করবে। এ অবিশ্বাস ও সন্দেহের জন্যে, একটা নীরব প্রতিবাদই, তার যতটুকু না করলে নয়, ততটুকুই করে। তার বেশী নয়।

আজ তারা প্রত্যেকেই বীরের মনোভাব নিয়েই কাজ করছে। কারণ এখনো, আলুগুদামের প্রতি তাদের একটি ক্ষীণ বিশ্বাস আছে। তাছাড়া এটাও বলা হয়েছে, 'উনি' যদি কারুর কাজ দেখে খুশি হন, অর্থাৎ 'ওঁর' নজরে পড়ে যেতে পারে, তার আখের আর দেখতে হবে না।

মনে তাদের একটা আশা আছে। যদিও এ রকম আশা তারা অতীতে অনেক করেছে। তবু আশার আর এক নাম নাকি মরীচিকা।

তাই আশা এবং নিরাশা, কাজে মনযোগ এবং 'ওঁর' প্রতি বিদ্রূপ এই উভয় রকমের মনোভাব রয়েছে তার মধ্যে।

অফিসের 'বাবুদেরও' তাই। এক সঙ্গে সব টাইপ মেসিন গুলি কোন সময়েই এমন কোরাস খট্‌খট্‌ সঙ্গীত করে না। সবাই এত ব্যস্ত যে, বুড়ো টাইপিষ্ট হরিহর বাবু কাগজ না সাজিয়েই টাইপ করছিলেন এবং যখন সেটা আবিষ্কৃত হল, তখন 'উনি' হরিহরবাবুর কাছেই দাঁড়িয়ে। হে ভগবান, হে ভগবান।

কিন্তু 'উনি' কিংবা 'ওঁরা' তাকান নি। কেবল, এই দারুণ ভুলের জন্ত হরিহরবাবুর হার্টের রোগটা অনেকখানি বেড়ে গেল।

'উনি' একলা আসেননি, একজন সহকারী হোমরাচোমরা প্রতিনিধিও এসেছেন।

কেননা, ব্যাপারটা আসলে, চটকলগুলির ওপর সরকারের সাম্প্রতিক কালের অনুসন্ধান। কোম্পানীর মুনাফা, নতুন মেসিন, র‍্যাশানালাইজেশনের প্রশ্ন নিয়ে নানারকমের কথাবার্তা চলছে। সেই উপলক্ষেই খোদ কর্তা এবং সরকারি প্রতিনিধিরা নানান জায়গায় চটকল সফর করছেন।

ব্যাপারটা খুবই ক্লান্তিকর, আর তাই, ভগবান বুদ্ধকে অশেষ ধন্যবাদ, চটকলের ম্যানেজারেরা পরিদর্শনের পর ক্লাব হলে রিফ্রেশমেণ্টের ব্যবস্থা ভালই করেন। সকলেই গলদ্‌ঘর্মপ্রায়। কিন্তু খবরদার। এক চুলও যেন এদিক ওদিক না হয়। ওভারসিয়াররা যেন নতুন মেশিনের তৎপরতা বোঝাতে যথেষ্ট সচেতন থাকেন, কেননা র‍্যাশনালাইজেশনের ওটাই আসল ভিত্তি। আর 'সেল মাষ্টার' অর্থাৎ বাণিজ্যের ব্যাপারে যার দায়িত্ব, তিনি যেন টুপিওয়ালা সরকারী প্রতিনিধিটিকে সব বিষয়ে বুঝিয়ে, বলে বলে তাঁর সমর্থন আদায় করতে পারেন। আর পারবেনই, কারণ সরকারী প্রতিনিধি নিজেও একজন ভাল সওদাগর।

ঝাড়ুদার ঝাড়ুদারনীরা জেনারেল ল্যাট্রিনের আড়ালে দাঁড়িয়ে এইসব বড়কা আদমিদের দেখছিল আর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল তাদের ঝাড়ু দেওয়া কোন্ কোন্ জায়গা সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার হয়েছে এবং সাহেবরা কার ঝাড়ুদেওয়া জায়গাটাকে দেখে খুসি হচ্ছেন মনে মনে।

ঠিক সেই সময়েই, বনোয়ারীর হাতটা কেটে গেল।

এ ভয়টা ছিল গত তিন মাস থেকেই। মেসিনটা খারাপ—যে কোন মুহূর্তে মণ খানেক ওজনের দাঁতালো চাকাটা তার ডানার ওপরে

পড়তে পারত। মেসিনটা নতুন, তাগবাগ সে ঠিক জানতনা। ওভারসিয়ার এঞ্জিনিয়ারবা; ঠিক ওয়াকিবহাল নয়, তাই মেসিন যারা বসিয়ে গিয়াছে, সেই আমেরিকান এঞ্জিনিয়ারটি না হলে মেসিনটা কিছুতেই ঠিক করা যাচ্ছিল না।

অবশ্য কোম্পানী বনোয়ারির বিপদটা বুঝতে পারছিল। কিন্তু তারা লাচার। বনোয়ারি কাজটা ছেড়ে দিতে পারে—নিজেই সে জবাব দিয়ে আখেরি ছুটি নিয়ে নিতে পারে।

কিন্তু বনোয়ারি যে তা'হলে খেতে পাবে না? বেকার হয়ে যাবে যে?

সেটাও একটা কথা। তা'হলেও কোম্পানী কি করবে? বসিয়ে মাইনে সে দিতে পারবে না। আর একজন যোয়ান মজুর বসে বসে মাইনে খায় কখনো? বনোয়ারিই বলুক না।

তাতো বটেই।

তবে? সুতরাং বিপদের ঝুঁকিটা নিয়ে সে চালিয়ে যাক। ব্যবস্থা শীঘ্রই হবে।

তাই চালিয়ে যাচ্ছিল বনোয়ারি। আর আজকে সবচেয়ে বেশী মনযোগ দিতে গিয়ে, সামলাতে পারলেনা সে। টিথ্-রোলটা যখন ওপরে উঠেছে, সে মেশিনের মধ্যে হাত দিয়ে, ব্রাশ দিয়ে, তেলের গাঁদ আর পাটের ফেসো পরিষ্কার করছিল। সেই সময়েই, মণ খানেক ওজনের দাঁতালো চক্রটা তার ডানার ওপর নেমে এল চোখের পলকে।

বনোয়ারি দেখল, তার ডান হাতঠা মেশিন রোলিংএর নীচে পড়ে, একবার মুঠি পাকাল, তারপর খুলে গেল।

সে চীৎকার করতে গেল। গলার স্বর ফুটল না। পড়ে গিয়ে সে গোঙাতে লাগল।

সর্দার টের পেয়ে ছুটে এল। খবর গেল ওভারশিয়ার, ম্যানেজার, লেবার অফিসারের কাছে। অমনি সকলের প্যাণ্টের বোতামগুলি ছিঁড়ে পড়বার যোগাড় হল যেন।

সর্বনাশ! 'ওরা' যে এখুনি ওখানেই যাচ্ছেন?

ম্যানেজার বললো, ওভারশিয়ারের কানে কানে,—শীগ্‌গির যাও। সরিয়ে ফেল।

ডাক্তারকে বললেন, জলদি যাও, দেখ কি ব্যাপার।

ওভারশিয়ার, চীফ্‌ ডাক্তার ছুটলেন। এসে দেখলেন, গোটা সেকশানের লোক ভিড় জমিয়ে ফেলেছে।

হটাও, হটাও। জলদি হটো। মেশিনে যাও সব। 'উনি' এসে পড়লেন বলে। দোহাই তোমাদের, যাও।

তাড়া দিলেন ওভারশিয়ার, সর্দার।

সরে গেল সবাই। একটা ভয়ংকর জরুরী ব্যাপার। মিটে যাক্‌, তারপরে তারা বনোয়ারিকে দেখবে, যদিও কাজে আর কারুর ভাল মন বসছেনা। একটা আতঙ্ক আর ক্ষোভে ওদের সকলের দু'চোখে ভয় আর ঘৃণা জমে রইল।

কিন্তু কোথায় সরানো যায় বনোয়ারিকে? ওভারসিয়ার আর ডাক্তারের মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। ওভারসিয়ার দেখলেন, ডাক্তারের মুখটা একেবারে সাদা।

কেন? বনোয়ারি মারা গিয়েছে নাকি?

কিন্তু যাই হোক, তাড়াতাড়ি সরাতে হবে। 'ওরা' এসে পড়ছেন। এসে পড়লেন ব'লে।

ওভারসিয়ারের চোখের সামনে ভাসতে লাগল, কোম্পানীর দৌলতে তার আসন্ন বিলেত যাত্রা আর ভাবী শ্বশুরের কাছ থেকে 'পণ' হিসেবে, সেভ্রলেট লেটেষ্ট মডেলের গাড়িখানা। সব, সব ধূলিস্মাৎ হ'য়ে যাবে।

তিনি চাপা গলায় প্রায় কেঁদে উঠলেন, সর্দার, শীগ্‌গির।

সহসা চোখে পড়ল, দশ ফুট সমান উঁচু প্যাকিং বাক্স সেকশানের এক কোণে জড়ো করা আছে। ওই খানেই, ওর আড়ালে সরিয়ে দিতে হবে।

কয়েকজন ধরাধরি করে তুলল বনোয়ারিকে। রেখে এস প্যাকিং বাক্সের আড়ালে। একটা চটও ঢাকা দিয়ে দেওয়া হ'ল। যদি 'ওরা' এদিকে আসেন, তবে নিশ্চয় চটের ঢাকা খুলবেন না।

কিন্তু, কি সর্বনাশ! সর্দার, বনোয়ারির হাতটা পড়ে আছে রেলিংএর পাশে।

ছোট্, ছোট্।

সর্দার হাতটা নিয়ে এল। ঢুকিয়ে দিল চটের তলায়।

'ওঁরা' এলেন। ঘুরলেন, দেখলেন।

এটা কি মেশিন? আই সী। সরকারী প্রতিনিধির উক্তি।

এই মেশিনটার গ্রোয়িং ক্যাপাসিটি কি রকম? নমুনা মাল দেখাও তো একটু। বাঃ, বেশ হয়েছে। বড় কর্ত্তার মন্তব্য।

ওঁরা' দেখলেন, একটিও মানুষ নেই সেকৃশানে। সকলেই এমন ভাবে মেশিনের সঙ্গে লিপ্ত হ'য়ে গিয়েছে যে, মানুষ মেশিনে তফাৎ করা যাচ্ছে না। বাঃ নাইস।

ভগবান বুদ্ধের কি অপরূপ লীলা। নব-ভারত সত্যি উন্নতি করেছে। এরাও মেশিনে এ রকম সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ করতে পারে!

—আচ্ছা, এগুলো কি? এই লাল মত?

ম্যানেজারের বুক কেঁপে উঠল, ওভারসিয়ারের মুখ সাদা হ'য়ে গেল, ডাক্তার ভয়ে ও উত্তেজনায় কেবলি খ্যাকারি দিতে লাগলেন।

বড় কর্ত্তা আবার জিজ্ঞেস করলেন, মেঝেতে এই লাল মত তরল পদার্থটা কি?

ইস্। ছি ছি, কী হবে? লাল তরল পদার্থটা বনোয়ারির রক্ত। সেটা মুছে নিতে কারুর মনেই হয়নি।

আর রক্ত অনেক খানি। গাঢ়, টকটকে লাল। ঠিক প্রকৃতির খাম খেয়ালী ভূ-খণ্ডের মত, অর্থাৎ ম্যাপের মত একটা দলা। কিছুটা গড়িয়ে গিয়ে, আবার থেমে গেছে।

ভারতবর্ষের মত? না, বোধ হয় অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাপের মত।

তাও নয়, বেশ চওড়া, লম্বা নয় খুব। ইংল্যাণ্ডের মতই বোধ হয়। চীনের মত নয়তো?

ম্যানেজার হেসে, জুতো দিয়ে একটু ঠেকিয়ে দেখে বলল, ওহো, এটা, মানে—

এটা রং।

—রং?

—হ্যাঁ, রং। মানে, এদের জানেন তো, এরা একটু রং ভালবাসে। বোধহয় নিজেদের মধ্যে একটু ফষ্টিনষ্টি করার জন্য কারুর গায়ে ছুঁড়ে দেবে ব'লে, মানে, আর কিছুই নয়, বুঝলেন না। এ দেশের লোকেরা একটু রসিক। কাজের মধ্যেও নিজেদের মধ্যেই একটু ইয়ার্কি ফাজলামি করতে ভালবাসে। অবশ্য আপনি যদি কিছু মনে না করেন স্যার—এই আর কি।

—ও, রং এটা?—সরকারী প্রতিনিধি বললেন।

হ্যাঁ, রং।

—নিশ্চয় কোন ভাল কারখানার ম্যানুফ্যাকচারিং, নয়?—বড়কর্ত্তার উক্তি।

—হ্যাঁ। ভাল কারখানার।

—দিশী কারখানার কি?—সরকারী প্রতিনিধির প্রশ্ন।

—বোধহয়।

—হুঁ। রংটা খুবই ভাল। খুব গাঢ়—বড় কর্ত্তা বললেন।

—আর রংটা পাকা নিশ্চয়ই, আর খুবই উজ্জ্বল।—সরকারী প্রতিনিধির বক্তব্য। বড় কর্তা মেশিনটার দিকে তাকালেন। এটা বন্ধ কেন?

—মেশিনটা একটু বিগড়ে আছে। চালালে এ্যাকসিডেণ্ট হ'তে পারে। একটা শারীরিক ক্ষতি হ'তে পারে, তাই আমরা এটা বন্ধ রেখেছি।

—খুব ভাল করেছেন। যদিও আপনাদের উৎপাদনের ক্ষতি

হ'চ্ছে, তবু এরকম ক্ষতি স্বীকার করেও কাউকে বিপদে না ফেলাটা, সত্যি আপনাদের চরিত্রের এটা, কি বলব, মানে, একটা আধুনিক শিল্পোন্নতির মহানুভবতা।

বললেন সরকারি প্রতিনিধি।

বড়কর্ত্তা বললেন, আমার তাই বিশ্বাস।

বলে তিনি দাঁতালো মেশিনটার গায়ে হাত দিয়ে কাবাব করার কাঁচা মাংসের মত একটুকরো মাংস আঙ্গুল দিয়ে তুলে আনলেন।

—এটা কি?

—এটা? এটা মানে, আপনার মানে, পশুর চর্বি দিয়ে এটা মাজা হয়েছিল, যদিও সেটা খুবই ভুল হয়েছে। মানে, আমরা এই পদ্ধতিতে মেশিন চালাইনা যদিও। ওটা তারই, একটা ফ্রাগমেণ্ট হবে। মানে—চর্বির।

—হুঁ। বড়কর্ত্তা বলবেন।

—সংসারে কিছুই ফেলা যায় না।—বললেন সরকারী প্রতিনিধি।

তারপরে ওঁরা আরো অনেক জায়গায় ঘুরলেন। ওভারসিয়ার, ম্যানেজার সবাই ঘুরতে লাগলেন ওদের সঙ্গে।

মেমসাহেব এবং অন্যান্যেরা ক্লাবরুমে রিসেপশনের ব্যবস্থা রেডি করে রেখেছিলেন। 'ওঁরা' খুবই ক্লান্ত হয়ে ঘুরে এলেন।

মিসেস্‌রা রং মাথা ঠোঁটে খুব হাসলেন। দেশী বিদেশী, সব মিসেস্‌রাই। বুকের সবটা তারা খুলে রাখতে পারেনি, তাই বুকের কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত পাতলা জামায় তারা ঢেকেছেন। না ঢাকলেও অনেক কিছু ফাঁস হয়ে যেতে পারে, তাই যতটা সম্ভব নিপুণতার সঙ্গে ঢাকা ও দেখানোটা বজায় রেখেই পুরুষ চিত্ত ক্ষত বিক্ষত করা পোষাক তারা পরেছেন। তারা মস্‌গুল করছেন ক্লাববার। তারা নিজেরাই মাননীয় অতিথিদের পরিবেশন করছেন।

তারাই প্রোগ্রাম করেছেন, আর সেই অনুযায়ী কনসার্ট শুরু হল। বিদেশী নাচের প্রোগ্রামটাই আগে রাখা হয়েছে।

বনোয়ারির চটের ঢাকনাটা অবশ্য আর খোলার দরকার হল না। ও তখন মারাই গিয়েছে। ওর হাতটা ওর পেটের ওপর বসিয়ে, একটা প্যাকেট করে ফেলা হল।

এর ব্যবস্থা কি হবে?

সমবেত প্রশ্নটা পাঠানো হল ক্লাব হলে।

জবাব এল, পরে জবাব দেওয়া হবে।

এক ঘণ্টা আগে ছুটি দেওয়া হল আজ। চটকলের ইতিহাসে এরকম ঘটনাও ঘটে। কারণ, আজ 'ওঁরা' এসেছিলেন, এটা শ্রমিকদেরই সুকৃতির ফল।

শ্রমিকরা মৃতদেহটা নিয়ে বসে রইল। 'ওঁরা' থাকা পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে বলে পাঠিয়েছেন ক্রুদ্ধ ম্যানেজার।

দেশী নাচের ঘূর্ণিতে, নটীর ঘাগ্‌রা ফোলানো আর দেহের নানান আঁকেবাঁকে অদ্ভুত সব ইন্দ্রিয়-কলাকৌশল দেখে, সরকারী প্রতিনিধি বললেন বড় কর্ত্তাকে, দেখুন, বৌদ্ধ শ্রমণ অবশ্য সুন্দরী যুবতী নারীকে অবলোকন মাত্র তার ভিতরের কংকালটাকেই দেখতে পেতেন। আমিও, এই নটীর একটা কি যেন দেখতে পাচ্ছি, বুদ্ধের কৃপায় সেটা একটা আশ্চর্য জিনিষ বলতে হবে।

—কংকাল কি?—বড়কর্ত্তা জিজ্ঞেস করলেন।

—না।—সরকারী প্রতিনিধি।

বড়কর্ত্তা সোহাগ ক'রে বললেন, জানি, তবে সেটা মাংস নিশ্চয়?

সরকারী প্রতিনিধি বললেন, আশ্চর্য! কি ক'রে বুঝলেন?

যন্ত্রটা দেখে।

—কোন্ যন্ত্র?

—যে যন্ত্রটা মাংস কাটে। মানে, (কানে কানে) আপনার বাসনা।

সরকারী প্রতিনিধির ভীষণ হাসি পেল। চোখ তার আগেই লাল হয়েছিল। বড়কর্ত্তার পেটে একটা খোঁচা মেরে বললেন, দুষ্টু।

ওঁরা সকলেই ভগবান বুদ্ধের শিষ্যা কংকালটার নানান অঙ্গভঙ্গি দেখে, নির্বাণ লাভের জন্য হাত নিস্‌পিস্ করতে লাগলেন।

আর এক ছায়া

এই ছোট মফস্বল শহরে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সংবাদটা রটে গেল,—অনন্ত ঘোষ দস্তিদারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুধা, বিজনবাবুদের আল্‌সেহীন চারতলার ছাদ থেকে পড়ে মারা গিয়েছে। এবং স্বয়ং অনন্তই নাকি পাশে বসে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে সুধাকে। এবং সুধাকে ধাক্কা দিয়ে চারতলার ওপর ফেলে দেবার পর, ছাদের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে, মৃগী রুগীর মত কাঁপতে থাকার ভান করেছিল।

সুধাকে বিয়ে করার মাত্র দু' মাস আগে, অনন্তর প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিমলা, কোন এক অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করেছিল। গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল সে। একটি চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল, 'বাঁচতে সাধ নেই। মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।– বিমলা।'

তখন প্রত্যক্ষভাবে কেউ অনন্তকে সন্দেহ না করলেও, পরোক্ষ একটা সংশয়ের ছায়া থেকে গিয়েছিল প্রতিবেশীদের মনে, হয়ত, কোন অতলস্পর্শী অন্ধকারে, অনন্তর হাত রয়েছে এই আত্মহত্যায়। কেন যে এই সংশয় ছিল তা কেউ পরিষ্কার করে বলতে পারত না হয়ত। তবে সংশয়ের মূলে সম্ভবত অনন্তর বিচিত্র চরিত্র।

অনন্ত একটি কারখানার স্টোরকীপার। মাইনে মোটামুটি মন্দ নয়। স্বামী-স্ত্রী, চাকর নিয়ে তার সংসার। কিন্তু সে বরাবরই একটি মস্তবড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থেকেছে। তার প্রথম পক্ষের একবছরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে, বিমলার কাছে সে অভিযোগ অনেকেই শুনেছে, অতবড় বাড়িত সে টিকতে পারে না। কিন্তু অনন্ত বাড়ি বদলায় নি। লোকের সঙ্গে মেলামেশা প্রায় নেই তার। কারুর

কারুর বাড়িতে সে বেড়াতে যায়। তাও খুব কম। গাড়ি-ঘোড়ায় কেউ কোনদিন তাকে চাপতে দেখে নি। চেঁচিয়ে কথা বলতে শোনে নি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতেও দেখা যায় নি কোনদিন। হঠাৎ সামান্য কারণে চমকে ওঠা একটা বাতিকের মত তার।

তাছাড়া অনন্তর চেহারার মধ্যেও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কি একটা চাপা রয়ে গিয়েছে যেন। সেটা তার চোখের জন্যও হতে পারে। তার ডান চোখের পাতা খানিকটা প্যারালাইজড্। সে চোখটি তার কখনই পুরোপুরি খোলে না। সামান্য একটু শাদা অংশ দেখা যায় মাত্র। বাঁ চোখটি পরিপূর্ণ খোলা। আয়ত, হয়ত সুন্দরও, কিছু সব সময় অপলক। মাংসল এবং খানিকটা ভাবলেশহীন মুখে, এই চোখ দুটি, একটি অদ্ভুত ছাপ ফুটিয়ে তুলেছে। ঢাকা পড়া চোখের মতই, আরও অনেক কিছু যেন ঢাকা পড়ে আছে তার মুখে। তার মনের মধ্যেও। সেই সঙ্গে অত্যন্ত নিচু গলায়, অল্প কথা বলার বিচিত্র ধরণ ধারণে, একটি অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ বলেই সবাই জানে।

চলে সে ধীরে। কথা বলে আস্তে। বলার চেয়ে, একটি চোখের অপলক চাউনি মেলে, চিন্তিত চোখে চেয়ে থাকে সে অনেকক্ষণ। যেন সে কিছু ভাবে।

সবটা মিলিয়েই তার বৈশিষ্ট্য, আর এই বৈশিষ্ট্যই, বিমলার অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যার পিছনে একটা সন্দেহের উদ্রেক করেছিল অনন্তর প্রতি।

কিন্তু কোন প্রমাণ ছিল না। পুলিশও কিছুই আবিষ্কার করতে পারে নি।

তারপর বিমলার আত্মহত্যার মাত্র দু' মাস বাদেই সুধাকে বিয়ে করে নিয়ে আসতে দেখে লোকের কাছে আরও খারাপ লেগেছিল। আর সুধাকে বিয়ে করেছে মাত্র ছ' মাস।

আজ ছ' মাস তেরোদিন বিয়ে হয়েছে। আজই ছাদ থেকে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মেরে ফেলেছে তার স্বামী অনন্ত।

বিজনবাবুর বারো বছরের মেয়ে ডলি বলেছে,—সে ছাদের ধারে অনন্ত কাকা আর সুধা কাকীকে বসে থাকতে দেখেছিল। সুধা মরবার আগে বলে গিয়েছে, তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

কে ফেলেছে ধাক্কা দিয়ে, সে কথা বলার অবস্থা তার ছিল না। আর ভূত প্রেত কিছু যদি আবিষ্কার করা না যায়, তাহলে অনন্ত ছাড়া ধাক্কা দেবার আর কেউ ছিল না। আর সে প্রমাণও ডলি দিয়েছে।

এতদিনে সকলের সন্দেহ যেন বাস্তব রূপ ধরে উঠল। অনন্ত ঘোষ দস্তিদারকে হাতে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কেন, ভিতরের সেই রহস্যটাই সবাই জানতে চায়।

থানায়, বড় দারোগার সামনেই বসেছিল অনন্ত। তার বন্ধু কারখানার হেডক্লার্ক বিজনবাবু বসেছিলেন অনেক দূরে। যেন ইচ্ছে করেই অনন্তর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দূরে বসেছেন। ডলি তার বাবার পাশেই। একটু দূরেই, মেঝের ওপর, রক্তমাখা কাপড়ে ঢাকা, হাড়গোড় ভাঙা সুধার মৃতদেহ।

বড় দারোগা দীনেশবাবুর পাশেই, মহকুমার নর্থ বিভাগের গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর বিবেকবাবু বসেছিলেন। তার পাশে একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর। সাব-ইন্সপেক্টর একটি ছোট ধারাল ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটছিল। আর মাঝে মাঝে শুনছিল এদিকের কথাবার্তা।

বাইরে পাড়ার লোকজন অনেক ছিল। দীনেশবাবু কাউকেই ঢুকতে দেন নি। তারা সব বাইরেই গণ্ডগোল করছিল।

বিবেকবাবু যেন প্রায় নির্বিকার ভাবেই তাকিয়েছিলেন অনন্ত ঘোষ দস্তিদারের দিকে। মনে মনে একটু অবাক হচ্ছিলেন এই ভেবে, অনন্ত সাব-ইন্সপেক্টরের পেন্সিল কাটার দিকে এত ঘন ঘন তাকাচ্ছে কেন?

বড় দারোগা দীনেশবাবুর চোখ আরক্ত। বোঝা যাচ্ছে, উনি ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। অনন্তকে ঘৃণা করতে শুরু করেছেন

ইতিমধ্যেই। বিমলার আত্মহত্যার কেসটা ওঁর হাতেই ছিল। অনন্তকে মনেপ্রাণে উনি সন্দেহ করেছিলেন। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও, কোন ক্লু খুঁজে পান নি। আজ শিকারকে অনেকখানি হাতের মুঠোয় পেয়ে, উনি খুশি নন। বরং একটা জাত ক্রোধ বাড়ছে ক্রমেই।

বিজনবাবুরও সেই অবস্থা। রাগের চেয়ে ওঁর ভয়ই বেশি। বিস্মিত ভয়ে তিনি ভাবছিলেন, কি করে এই সাংঘাতিক লোকটির সঙ্গে এতদিন সম্পর্ক রেখেছিলেন। কেমন করে এতখানি অন্ধ হয়ে ছিলেন।

অনন্ত বসেছে সামনের দিকে তাকিয়ে। তার অপলক বাঁ চোখের পাশে, ডান চোখের অনড় পাতাটা ক্রমেই যেন আরও মুদে আসছে। সে যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে, চোখের পাতাটা তোলবার। তাতে শুধু তার ডান দিকের গালের মাংসল পেশী কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু তার ভাবলেশহীন মাংসল মুখে উত্তেজনা টের পাওয়া যায় না। ভয় কিংবা দুঃখ, কিছুই যেন ছায়াপাত করে না তার মুখে।

বিবেকবাবু দেখছিলেন, অনন্তর মুঠি পাকান। ডান হাতের মুঠি সে ঘন ঘন খুলছে, বন্ধ করছে। আর সাব-ইন্সপেক্টরের পেন্সিল কাটা ছুরির দিকে, যেন কোন অদৃশ্য শক্তি বারে বারে তার অপলক এক চোখের দৃষ্টি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কেন?

দীনেশবাবু বিজনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ, তারপর বলুন।

বিজনবাবু বললেন, হ্যাঁ, এঁদের (অনন্তদের) বেড়াতে আসার কারণ জিজ্ঞেস করছিলেন তো? কোন কারণ নেই। এমনি, যেরকম সহকর্মীকে বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করা হয়, সেইভাবেই নিমন্ত্রণ করেছিলাম।

দীনেশবাবু—এরা ছাদে গিয়ে বসেছিল কেন?

বিজনবাবু—ছাদে বসেই চা খাবার কথা হয়েছিল। গরম কাল। আমার স্ত্রী বলল, 'চল ছাদে গিয়ে চা খাই। আমাকে বলল, তুমি

অনন্তবাবু আর সুধাকে নিয়ে'—মানে আমার স্ত্রী এর স্ত্রীকে নাম ধরেই ডাকত কিনা। বলল, 'এদের নিয়ে তুমি ছাদে গিয়ে বসো। আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি ঠাকুরকে দিয়ে। নিজের হাতে চা করে নিয়ে যাচ্ছি।' কিন্তু আমার তখনও গা ধোয়া হয় নি। সুধা, মানে এর স্ত্রী, আমিও তাকে নাম ধরেই ডাকতুম। সে আমাকে দাদা বলে ডাকত। আমার স্ত্রীকে বলত দিদি। মেয়েটি, কি বলব আপনাকে দারোগাবাবু; এমন মেয়ে—

বলতে বলতে বিজনবাবুর গলা ভয়ে ও দুঃখে ধরে এল। রক্তাক্ত মৃতদেহের দিকে একবার ফিরে দেখলেন।

দীনেশবাবু অনন্তর দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, বিজন বাবুকে বললেন, হ্যাঁ, সুধার কথা কি বলছিলেন ?

বিজনবাবু—সুধা আমাকে বলল, 'দাদা আপনি গা ধুয়ে আসুন, দিদি চা করুক, আমরা ততক্ষণে ছাদে গিয়ে বসি।' এ (অনন্ত) বলল, 'হ্যাঁ, আমারা তাই বসিগে, আপনারা তৈরি হয়ে আসুন।' তারপরই এরা ছাদে চলে গেছল।

—ক'তলা ছাদ ?

—চারতলা।

—এরকম সান্ধ্য চা-পান অতীতে হয়েছে আপনাদের ?

—হ্যাঁ, আরও বার তিনেক হয়েছে।

—তখনও কি এরা (অনন্তরা) একলা এরকম ছাদে গিয়ে বসেছে ?

—না। আমরা সবসময়েই সঙ্গে ছিলুম।

—হুঁ। এই অনন্ত ঘোষ দস্তিদারকে আপনি কতদিন ধরে জানেন ?

—পাঁচ বছর।

—আলাপ কোথায় ?

—অফিসে।

—এর প্রথমা স্ত্রী বিমলাকে আপনি দেখেছিলেন ?

—হ্যাঁ। আমাদের বাড়ি বেড়াতেও আসত।

—যেরকম সুধাও আসত?

—না, অতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না তার সঙ্গে।

দীনেশবাবু চুপ করে খানিকক্ষণ লিখলেন।

সাব-ইন্সপেক্টর তখন পেন্সিল কাটা রেখে ছুরি দিয়ে নখ কাটছে। বিবেকবাবু দেখলেন, অনন্তর ডান হাতটা যেন ঠিক ছুরি ধরার ভঙ্গিতে শক্ত হয়ে উঠছে।

বিবেকবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন সাব-ইন্সপেক্টরকে, অরুণবাবু, হাত কাটবেন।

অরুণবাবু চমকে গিয়ে, হেসে ফেলল। বলল, আপনার আবার এদিকেও নজর পড়ে গেল?

বিবেকবাবু হেসে বললেন, ভয় হল, হাত-টাত কেটে ফেলবেন শেষটায়। থাক না।

বিবেকবাবু বুঝতে পারছিলেন, অনন্ত তার একটি চোখের অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে।

আর আশ্চর্য! অরুণ ছুরিটা বন্ধ করতেই, অনন্তর হাতের মুঠি শিথিল হয়ে গেল।

বিবেকবাবু ঠোঁট টিপে, আঙুল দিয়ে টেবিলে আপন মনে লিখলেন, yes।

দীনেশবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন বিজনবাবুকে, 'আপনি সুধার চিৎকার শুনতে পেয়েছিলেন?'

বিজনবাবু—হ্যাঁ। আমি বাথরুমে ছিলাম। বাথরুমের কাছে খিড়কীর উঠোনের শানের ওপরেই পড়েছিল সুধা। চিৎকার ঠিক নয়, মনে হয়েছিল, ছাদের ওপরেই যেন কে চেঁচিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই ধুপ করে শব্দ শুনে বাইরে এসে দেখলুম—

বিবেকবাবু বলে উঠলেন, এক মিনিট। আপনি সুধাকে দেখলেন পড়ে আছে?

হ্যাঁ।

বিবেক—ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন?

বিজন—হ্যাঁ। দেখলুম অনন্তবাবু তাকিয়ে আছেন। অনেকক্ষণ পর নেমে আসেন।

বিবেক—এসে?

বিজন—সুধার গায়ে হাত দেন, আস্তে আস্তে ডাকেন। কিন্তু সুধা জবাব দেয় নি। তার মুখের কষ দিয়ে তখন রক্ত পড়ছে। মাথার চুলের গোছা ভেদ করে, ভলকে ভলকে রক্ত বেরুচ্ছে। কিন্তু চোখ তাকিয়েছিল, স্থির চোখে, যেন দৃষ্টি নেই। তার হাত পা যেমন পড়েছিল, তেমনি ছিল। সে নড়তে পারে নি। সুধা তখন মারা গেছে।

বিবেক—অনন্তবাবু আসবার আগে সুধাদেবী কতক্ষণ বেঁচেছিলেন, আর কি বলেছিলেন?

বিজনবাবু বললেন, পাঁচ মিনিট বেঁচেছিল। সুধা ঠোঁট নাড়ছিল। আমার স্ত্রী তাড়াতাড়ি তার মুখে একটু জল ঢেলে দেয়। জলটা খেয়েছিল বোধ হয়। তারপর হঠাৎ চোখ বড় বড় করে, জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করে। আমরা ঝুঁকে পড়েছিলুম তার দিকে। সুধা ভাঙা ভাঙা চাপা চাপা গলায় শুধু বলেছিল, 'ধাক্কা, ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে। ধাক্কা—ধাক্কা—' তারপর আর কথা বলতে পারে নি। পাঁচ মিনিট পরেই সুধা মারা যায়।

দীনেশবাবুর কলম দ্রুত চলেছে।

বিবেকবাবু দেখলেন, অনন্ত ভাবলেশহীন মুখে বিজনবাবুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু বাঁ চোখটা আরও বড় হয়ে উঠেছে যেন তার। ডান হাতটা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে। যেন বিজন বাবুর দিকে এগিয়ে নিতে চাইছে।

বিবেকবাবুর সঙ্গে সাব-ইন্সপেক্টরের চোখাচোখি হল। দু'জনেই তাকিয়েছিলেন অনন্তর দিকে।

বিবেকবাবু ডলির দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি ছাদে গিয়ে কি দেখেছিলে খুকি?'

ডলি প্রথমে কথাই বলতে পারল না। কেশে কেশে ঢোক গিলে গিলে বলল, আমি, বুণ্টু, খোকন, মীনু সবাই ছাদে উঠেছিলুম।

বিবেকবাবু—অত উঁচু ছাদ, আলসে নেই, তোমরা উঠেছিলে কেন? বাবা মা বারণ করেন না?

ডলি—হ্যাঁ। অনন্ত কাকা আর সুধা কাকী ছিলেন, তাই গেছলুম! আমি সিঁড়ি-ঘরের দেয়ালের পাশে লুকিয়েছিলুম। বুণ্টুরা চুপি চুপি এসে, যেই আমাকে ধরেছে, ঠিক সেই সময়—

বিবেকবাবু—তোমরা ওঁদের দু'জনের কাছ থেকে কতদূরে ছিলে?

ডলি—অনেকখানি দূরে।

বিবেকবাবু—তুমি যেখানে লুকিয়েছিলে; সেখান থেকে ওঁদের দেখতে পেয়েছিলে?

ডলি—হ্যাঁ।

ডলির মুখ একটু লাল হল যেন। যদিও তার মাত্র বারো বছর বয়স। বিজনবাবুর দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নত করে বলল, সুধা কাকীর হাত ধরেছিলেন অনন্ত কাকা। সুধা কাকী হাসছিলেন যেন কেমন করে।

বিবেক—কেমন করে?

ডলি—যেন লজ্জা-লজ্জা মতন।

বিবেক—তারপর?

ডলি—তারপর দেখলুম, সুধা কাকী পড়ে গেল, যেমনি ওরা এল। আমরা হাসছিলুম, চেঁচাচ্ছিলুম আর সেই সময় সুধা কাকী 'আঁ' করে উঠল। আর অনন্ত কাকার হাতটা তখন তোলা ছিল।

বিবেক—কি রকম?

ডলি—এমনি করে।

বলে ডলি তার হাতটা কাঁধ বরাবর তুলে দেখাল। প্রায় যেন ট্রাফিক পুলিশের মত।

বিবেক—তারপর ?

ডলি—উনি উঁকি দিয়ে দেখলেন যেন।

বিবেক—তারপর ?

ডলি—উনি ছাদের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কি রকম করছিলেন।

বিবেক—কি রকম ?

ডলি—যেন কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে মুখ ঘষছিলেন। যেন ফেলে দিয়ে, তারপর ভয় হয়েছিল অনন্তকাকার।

বিবেক—তারপর ?

ডলি কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। বিবেকবাবু বললেন, 'তোমরা কি করলে ?'

ডলি—আমরা ভয়ে কাট হয়েছিলুম। দুড়দাড় করে নিচে মার কাছে ছুটে গেছলুম।

বিবেক—হুঁ।

দীনেশবাবু তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন অনন্তর দিকে। অনন্ত তাকিয়েছিল ডলির দিকে। ডলি সেই চোখের দৃষ্টি থেকে ভয়ে মুখ ফিরিয়েছিল।

দীনেশবাবু অনন্তকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব কথা সব সত্যি ?'

অনন্ত ঘাড় কাৎ করে সায় দিল।

দীনেশ—তাহলে, স্ত্রীকে মারবার জন্যেই ছাদে নিয়ে গেছলেন ?

অনন্ত বলল,—না।

দীনেশ—ছাদে গিয়ে মতলব এঁটেছিলেন তাহলে ?

অনন্ত—কিসের ?

দীনেশ—খুন করবার।

অনন্ত—না।

দীনেশ—তবে কখন মতলব করেছিলেন ?

অনন্ত—কিসের ?

দীনেশবাবুর চোখ দপদপিয়ে উঠল। চাপা গলায় প্রায় হিসিয়ে উঠলেন,—ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার ?

অনন্ত · মতলব করি নি।

অনন্তর সুরহীন গোঙা-স্বরের মত গলায় যেন নিষ্ঠুর ও যান্ত্রিক জবাবদিহি। নির্ভয় শুধু নয়, নির্বিকারও বটে।

দীনেশ—তবে ধাক্কা দিয়েছিলেন কেন ?

অনন্ত—ধাক্কা তো আমি দিই নি।

দীনেশ—তবে পড়ল কেমন করে ?

অনন্ত—কি জানি !

বোধ হয় প্রচণ্ড রাগেই দীনেশবাবুর মুখ থেকে কয়েক মুহূর্ত কথা বেরুলো না। তারপরে বললেন,—আপনার স্ত্রী যে বলেছিলেন, ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে, সেটা আপনিও শুনেছিলেন ?

অনন্ত—না।

দীনেশ—সেটা কি মিথ্যে কথা ?

অনন্ত—জানি নে।

দীনেশ—জানতে পারবেন।

অনন্ত—আজ্ঞে ?

দীনেশ বিবেকের দিকে তাকালেন। বললেন, তাহলে আজকের রাতটা থানার custody-তেই রাখা যাক, আগামীকাল সাবডি-ভিশনাল—

বিবেক হঠাৎ বললেন, না। ছেড়ে দিন, বাড়িতে যাক।

সকলেই বিস্ময়ে চমকে উঠল। দীনেশ বললেন, বেল্ দিতে বলছেন ?

বিবেক—হ্যাঁ।

দীনেশ—তারপর ?

বিবেক—দেখা যাক্।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ। বিবেকবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে, দীনেশবাবু আর আপত্তি করলেন না।

উকিল ডাকিয়ে বেল দেবার ব্যবস্থা হল।

বিবেক বললেন অনন্তকে,—বাড়ি যেতে পারেন।

অনন্ত বিজনবাবুর দিকে ফিরে বলল, এখন আর বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না বিজনবাবু। আজকের রাতটা আপনার বাড়িতেই থাকতে দিন আমাকে।

বিজনবাবু যেন উদ্যত যমকে দেখে আঁতকে উঠলেন,—আমার বাড়িতে?

অনন্ত তেমনি স্বরহীন গলাতেই যেন অনেক দূর থেকে বলল,—হ্যাঁ, আমার বাড়িতে আজ একলা থাকতে বড় কষ্ট হবে।

বিজনবাবু অসহায়ের মত তাকালেন দীনেশবাবুর দিকে।

বিবেকবাবু বললেন অনন্তকে,—কষ্ট হলেও, আজ আপনাকে আপনার বাড়িতেই যেতে হবে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে অনন্ত তাকিয়ে রইল বিবেকবাবুর দিকে। তারপর বলল, ও! আচ্ছা!

সুধার মৃতদেহ মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

তিনদিন পর।

বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত। রাত প্রায় বারোটা। দক্ষিণা বাতাস যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে রাতের এই নিরালা অন্ধকারে। কোথায় একটা রাতের পাখি টেনে টেনে দুর্বোধ্য কাকলী গাইছে।

বিবেকবাবু এসে দাঁড়ালেন অনন্তর বাগানওয়ালা সেকেলে মস্তবড় বাড়িটার সামনে। এসে দেখলেন, সদর-দরজাটা হাট করে খোলা। একটু অবাক হলেন। তারপরে ঠোঁট টিপে হাসলেন।

সাব-ইন্সপেক্টর অরুণ সঙ্গে ছিল। সে বড় বড় চোখে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল,—মালি তাহলে ইচ্ছে করেই দরজা খুলে রেখেছে?

বিবেক—বোধ হয়।

অরুণ—আন্দাজ করেছে তাহলে আপনি আসতে পারেন।

বিবেক—হয়তো। আপনি চলে যান অরুণবাবু।

অরুণ—আপনি ?

বিবেক—আমি ভিতরে যাব।

অরুণ—একলা ? একটা বিপদ-আপদ যদি কিছু ঘটে ?

বিবেক—এখন কিছু ঘটবে না। আপনি যান।

বিবেক সদর-দরজা পেরিয়ে বাগানে ঢুকলেন।

কোন দরজা-জানালাতেই আলো দেখা যায় না। মস্তবড় বাড়িটা যেন কিম্ভুতাকৃতি প্রেতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিবেক দেখলেন, বৈঠকখানার দরজাও খোলা। টর্চ জ্বেলে দেখলেন, দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির দরজাও বন্ধ নেই। এদিক—ওদিক দেখে, ওপরে উঠলেন বিবেক। দোতলার বারান্দা-সংলগ্ন তিনটি ঘর। মনে হল তিনটি ঘরেরই দরজা খোলা।

বিবেকের ভ্রু কুঁচকে উঠল। পালাল নাকি ?

প্রথম ঘরটায় ঢুকলেন তিনি। বসবার ঘর। টর্চের আলোয় চারিদিকটা দেখে নিয়ে, ঘরের এক কোণে টেবিলের ওপর তাকালেন বিবেক। দুটো ফটো। একটি অনন্ত আর সুধার। অনন্তর মুখটা ফটোগ্রাফার কায়দা করে এমন য়্যাঙ্গল থেকে নিয়েছে, যাতে তার ডান চোখটা দেখা না যায়। কিন্তু আর একটি ফটো কার। একটি যুবকের ফটো, মুখখানি সব মিলিয়ে বেশ ভালই।

বিবেকের মনে হল, কোথায় যেন একে দেখেছেন। চেনা-চেনা লাগছে মুখখানি। এই অঞ্চলেরই ছেলে কিনা, খেয়াল করতে পারলেন না ঠিক। অনন্তর আত্মীয় কিংবা ভাই হওয়ারও কথা নয়। কারণ তার কেউ নেই বলেই সবাই জানে। যার ফটো, সে নিশ্চয়ই আপন। নইলে, স্বামী-স্ত্রীর ফটোর পাশে এর জায়গা মিলত না।

বিবেক ফটো থেকে মুখ ফিরিয়ে, দরজার দিকে ফিরতেই চমকে

উঠলেন। দরজায় মানুষের মূর্তি। চকিতে ডান-হাত পকেটে ঢুকিয়ে, মূর্তির ওপর টর্চের আলো ফেললেন।

অনন্ত।

অনন্ত হাত দিয়ে চোখ ঢাকা দিল। সুইচের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, কে ?

বিবেক বললেন,—আমি।

অনন্ত সুইচ টিপে, বিবেকের দিকে তাকাল।

বিবেক দেখলেন, ঘুম থেকে উঠে আসার মত অবস্থা নয় মোটেই অনন্তর। যদিও চুল তার উস্‌কো-খুস্‌কো। কোঁচাটা মাটিতে লুটোচ্ছে। ঢোলা হাতা আদ্দির পাঞ্জাবীটার সোনার বোতামগুলি খোলা।

ডান চোখটা তার এখন একেবারেই বোজা। বাঁ চোখটা যেন অনেক বেশি বড় আর সাপের মত অপলক মনে হল।

অনন্ত বলল,—আপনি ?

বিবেক—হ্যাঁ।

অনন্তর সেই একই স্বরহীন, দূরাগত ধ্বনির মত গলা। বলল, —আমি মনে করেছিলাম চোর।

বিবেক বললেন,—না, চোর নই, তবে চোরের মতই এসেছি।

অনন্তর ডান দিকের গালের পেশী কেঁপে উঠল। বলল,—খুনীকে ধরতে ?

বিবেক হেসে বললেন,—না। কথা বলতে। আপনার দরজা খোলা দেখে আর ডাকি নি। নইলে ডাকতুম। কিন্তু এভাবে খুলে রেখেছেন; চোর তো আসতে পারত!

অনন্ত বলল,—তা আসতে পারত। তবে, আমি তো জেগেই থাকি। ঘুম আসে না।

বিবেক—কেন ?

অনন্ত স্বরহীন নির্বিকার গলায় বলল,—সুধার কথা মনে পড়ে।

বিবেক কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইলেন অনন্তের দিকে।

অনন্ত তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে বলল,—বসবেন, না অন্য ঘরে যাবেন।

বিবেক বললেন,—আপনার শোবার ঘরে একবার যেতে চাই।

—চলুন।

অনন্ত আগে আগে গেল একেবারে শেষ কোণের ঘরটায়। আলো জ্বালল। বিবেক এলেন এদিক-ওদিক দেখে, আলমারির মধ্যে একটি অদ্ভুত ফটো ওঁর নজরে পড়ল। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, একটি পুরুষ পিছন ফিরে বসে আছে। তার পিঠে হেলান দিয়ে একটি মেয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে হাসছে। মেয়েটি সুধাই। মাথায় তার ঘোমটা নেই।

বিবেক ফটোটি দেখিয়ে বললেন,—আপনার স্ত্রী না?

—হ্যাঁ।

—ভদ্রলোকটি কে?

—আমি।

বিবেক সন্দিগ্ধ চোখে অনন্তর দিকে ফিরে বললেন,—আপনি?

—হ্যাঁ।

যেন পিছন-ফেরা পুরুষ মূর্তিটার সঙ্গে অনন্তকে মেলাবার চেষ্টা করলেন বিবেক। কিন্তু মেলাতে পারলেন না। বললেন,—কে তুলেছিল ফটোটা?

—সুধার জামাইবাবু।

—কোথায় থাকেন তিনি?

—পাটনা।

—নাম?

—কিষণলাল ঝা।

—ঝা? বিহারী?

—মৈথিলী।

—কি করেন ভদ্রলোক ?

—ব্যবসা করেন।

—কিসের ব্যবসা ?

—ঠিক জানি নে।

—আপনি কখনো পাটনায় যান কি ?

—একবার। বিয়ে করতে। কিষণবাবুর বাড়িতেই বিয়ে হয়েছিল।

—কিষণলাল আপনার স্ত্রীর ছোট বোনের স্বামী ?

—না, বড় বোনের। শুনেছি প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল।

—হুঁ। ঝা কতবার এসেছেন এখানে ?

—বার তিনেক।

—এই ছ' মাসের মধ্যে ?

—হ্যাঁ।

—হুঁ।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন বিবেক, আপনার প্রথম স্ত্রীর কোন ফটো নেই ?

—আছে, অন্য ঘরে।

—চলুন, একটু দেখি। আপনি যখন জেগেই থাকবেন, তখন এত রাত্রে বিরক্ত হচ্ছেন না নিশ্চয় ?

অনন্ত কোন জবাব দিল না।

মাঝের ঘরে এসে বিমলার ফটো দেখতে দেখতে, হঠাৎ বিবেক জিজ্ঞেস করলেন, বৈদিকপাড়ার গেনুকে চেনেন আপনি ?

গেনু ?

প্রশ্ন করতে করতেই অনন্ত মুখটা অন্যদিকে ফেরাল। বলল, গেনু কি ?

বিবেক অনন্তর পিছন দিকেই তাকিয়ে বললেন, গেনু ওরফে জ্ঞান পাঠক।

অনন্ত খুব নিচু অথচ পরিষ্কার গলায় বলল, 'চিনি নে'।

—আপনার প্রথম স্ত্রী বিমলা দেবী চিনতেন ?

—জানি নে।

বিবেক পরিষ্কার গলায় প্রায় হুকুমের সুরে বললেন, অনন্তবাবু আপনি দয়া করে এদিকে ফিরে কথা বলুন।

অনন্ত ফিরল, কিন্তু তার একটি চোখের দৃষ্টি বিবেকের দিকে নয়। সামনে দেওয়ালের দিকে।

বিবেক বললেন, বিমলা দেবী তো বৈদিকপাড়ারই মেয়ে ছিলেন ?

—হ্যাঁ।

গেনুবাবু কি আপনার স্ত্রীর বাল্যের বন্ধু ছিলেন না ?

জানি নে।

—লুকোচ্ছেন কেন ? বিমলা দেবীর সঙ্গে গেনুবাবুর যুগল ফটো দেখেন নি আপনি কোনদিন ? বিমলা দেবীর সুটকেস থেকে সেটা তো আপনি আবিষ্কার করেছিলেন, নয় কি ?

—আমি জানি নে।

বিবেক হাসলেন। বললেন, না জানলে চলবে কি করে অনন্তবাবু ? গেনুবাবু তো বিয়ের পর প্রথম প্রথম আপনার বাড়িতেও এসেছেন।

নিরুত্তেজ গলাতেই বলল অনন্ত, এসে থাকলেও, আমি জানি নে।

—জানেন। বিমলা দেবী সহ, গেনুবাবুর সঙ্গে আপনি সিনেমায় গেছেন বার দুয়েক।

—মনে পড়ছে না।

—মনে পড়ত, যদি না অপনি গেনু পাঠককে ঘৃণা করতেন। গেনু আপনার স্ত্রীর প্রেমিক ছিলেন।

অনন্ত সরে গিয়ে, একটি চেয়ারে বসল। বলল, এসব কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না।

—তা স্বাভাবিক। তবে, আপনার চাপবার কিছু নেই। দেখুন তো, এই হাতের লেখা চিনতে পারেন ?

অনন্তর এক চোখের নজর পড়ল কাগজের গোছার ওপর। আর ডান দিকের গালের মাংসপেশী কেঁপে উঠল। বলল, চিনি, বিমলার।

—কাকে লেখা, নিশ্চয় জানেন ?

—না।

—জানেন, বলতে চান না। গেনুবাবুকেই লেখা। আর, বিমলা দেবী মরবার আগে, দুটি চিঠি দিয়ে গিয়েছিলেন। একটি 'মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়,' অপরটি আজও অনাবিষ্কৃত রয়েছে। নয় কি ?

অনন্ত বলল, কি করে জানব বলুন।

—আপনার কাছে নেই তো ?

—না।

—থাকলেও আপনি দেখাতে চান না। কিন্তু অসুখ-বিসুখ হলে, ডাক্তারকে যেমন সব কথা পরিষ্কার খুলে বলা ভাল, এখানেও তাই হওয়া উচিত।

অনন্ত উঠে দাঁড়াল। বিবেকের মুখের দিকে তার এক চোখের দৃষ্টি পড়ল সার্চলাইটের মত। বলল, নইলে বিমলার মৃত্যুর জন্য দায়ী করবেন, এই তো ?

—না, সরাসরি দায়ী করা যায় না। তবে, দায় আপনার একটু থেকে যায়।

বলে, বিমলার একটি চিঠি বার করে বললেন, বিমলা দেবীর চিঠির একটি জায়গা আপনাকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি। এক জায়গা থেকে পড়লেন বিবেক, 'আমি যার জ্বালার কারণ, আমি মরলেই যে মানুষ মুক্তি পায়, তাকে আমি আসল কথাটি জানাতে চাই। মুখে নয়, লিখে। যে কথা তোমাকে লিখে লাভ নেই।' হয়ত আপনি সেই 'মানুষ' অনন্তবাবু, যার 'জ্বালা' ছিল, 'মুক্তির'ও প্রয়োজন ছিল, যাকে বিমলা দেবী আসল কথাটি লিখে রেখে গেছেন। 'যে মানুষকে' মনে করা যায়, 'জ্বালা' জুড়োবার জন্য এবং 'মুক্তির' জন্য বিমলা দেবীকে

গলায় দড়ি দিতে বাধ্য করেছে সে। হয়ত সামনে দাঁড়িয়ে থেকেই সেই 'মানুষ' বিমলা দেবীর গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলা দেখেছে।

বিবেক কথাগুলি বলছিলেন অনন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে। তিনি দেখছিলেন অনন্তর ডানদিকের গালের মাংসের দ্রুত কম্পন। আর খোলা চোখের অপলক চাউনিটাকে কেমন যেন কুৎসিত মনে হতে লাগল। যদিও বাঁ চোখটাই কুৎসিত অনন্তর। আর বাঁ চোখটার জন্যেই ডান চোখটা অনেক বড়, ঠাণ্ডা নির্নিমেষ কিন্তু কঠিন বলে মনে হয়।

অনন্তর গলার স্বরটা যেন আরও গোঙা শোনাল। বলল, তাহলে সেইটেই প্রমাণ করবার চেষ্টা করুন।

বিবেক বললেন, তার জন্যে কোন আজেবাজে কিছু প্রমাণ করতে চাই নে। সত্যটাকেই প্রমাণ করতে চাই। তাতে আপনার সাহায্য চাই। আচ্ছা, আপনি অফিসে যাচ্ছেন না কেন?

—ভাল লাগে না।

একটু চুপ করে থেকে বিবেক বললেন, আচ্ছা অনন্তবাবু, ডলি যে বলছিল, সুধা দেবীও পড়ে গেলেন আর আপনার হাতটা উঠেছিল তখনও, এটা কি ঠিক?

অনন্ত কি ভেবে বলল, বোধ হয়।

—আপনি কী স্থির নিশ্চিত, ধাক্কা দেন নি?

অনন্ত নীরব।

—বলুন অনন্তবাবু!

—কি বলব?

—আপনি নিশ্চিত জানেন, আপনি ধাক্কা দেন নি?

—আমি ধাক্কা দিলে, আমি জানব না?

—তাহলে দেন নি?

—না।

—আচ্ছা, আপনার ভায়রাভাই কিষণলাল ঝায়ের সঙ্গে আপনার আলাপ কেমন?

প্রশ্নের দ্রুত পরিবর্তনে সহসা খেই পাওয়া যায় না।

অনন্ত—মোটামুটি।

—ছ মাসের মধ্যেই, তিন বার এসেছিলেন কেন? শালীর সান্নিধ্যের জন্যে, না আপনার?

—মানে?

—মানে, সুধা দেবীর সঙ্গে কিরকম ভাব ছিল কিষণলালবাবুর?

—যে রকম থাকা উচিত?

—অর্থাৎ শালী-ভগ্নিপতির মতই, না? আপনার কিরকম লাগত তাকে?

—ভাল।

—আপনার সঙ্গে সুধা দেবীর বিয়ের আগেও কি এ অঞ্চলে যাতায়াত ছিল এই কিষণলালের?

—জিজ্ঞেস করি নি।

—এসে কদিন থাকতেন?

—দু-একদিন।

—আপনার শালী, অর্থাৎ সুধা দেবীর দিদিও সঙ্গে আসতেন?

—একবার এসেছিলেন।

বিবেকবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আচ্ছা, চলি। একেবারে এভাবে সব খুলে রাখবেন না। সত্যিসত্যি চুরি-চামারি হতে পারে। যা দিনকাল।

বিবেক চলে গেলেন। অনন্ত তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাত্রি দুটোর ঘণ্টা বাজল পেটা ঘড়িতে।

বিজনবাবুর বাড়ি। বিকেলবেলা বাইরের ঘরে বিজনবাবু, তার স্ত্রী যমুনা, আর বিবেক বসেছিলেন।

বিবেক বললেন, আপনারা তো অনেকদিন ধরেই চেনেন অনন্তকে।

বিমলার আত্মহত্যার ব্যাপারে সকলের মনেই একটা খটকা ছিল। আপনাদের ছিল না ?

বিজনবাবু বললেন, দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি, বিমলার আত্মহত্যার একটা কারণ মোটামুটি জানি।

বিবেক—যথা ?

বিজন—শুনেছিলুম, বৈদিকপাড়ার গেনু পাঠকের সঙ্গে তাঁর প্রেম ছিল। তাকে না পাওয়ার দরুনই সে আত্মহত্যা করেছে, আমাদের ধারণা।

বিবেক—কিংবা ধরুন অনন্ত তাকে মরতে বলেছিল। হিংসায় ও রাগে, সে হয়ত গলায় দড়ি দিতে বাধ্য করেছিল বিমলাকে।

বিজনবাবু ও যমুনা একসঙ্গে সভয়ে বলে উঠলেন, এখন তো আমাদের সেই সন্দেহই হচ্ছে।

বিবেক—কবে থেকে মনে হচ্ছে ?

যমুনা—সুধার ব্যাপারের পর থেকে।

বিবেক—আচ্ছা, সুধারও এরকম গেনুবাবু কেউ ছিল না তো ?

ওঁরা স্বামী স্ত্রীতে একবার চোখাচোখি করলেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। যমুনা বললেন—না, কখনও কিছু টের পাইনি তো।

বিবেক—সুধার ভগ্নিপতিকে আপনারা চিনতেন ?

বিজন—হ্যাঁ।

বিবেক—এসেছেন কখনও আপনাদের বাড়িতে ?

যমুনা—একবার এসেছেন।

বিবেক—আচ্ছা, উনি সুধার বিয়ের ছ মাসের মধ্যে পাটনা থেকে তিনবার এখানে এলেন কেন, কিছু বলতে পারেন ? বিশেষ কিছু না থাকলে, শুধু শুধু পাটনা থেকে এতবার আসা, কেমনতর নয় কি ?

যমুনা—ঠিক বলতে পারি নে। তবে সুধার মুখে শুনেছি, উনি এদিকে আগেও আসতেন। কি সব ব্যবসা নাকি তার আছে।

বিবেক—কিসের ব্যবসা ?

যমুনা—সেটা কোনদিন বলে নি, আমি জিজ্ঞেসও করি নি। তবে কিষণলালবাবু নাকি সুধাকে বলতেন, 'মিচকী, তোর এখানে বিয়ে হয়ে, ভায়রাভাইয়ের দৌলতে আমার হোটেল খরচটা বেঁচে যাচ্ছে।' তবে—

যমুনা বিজনবাবুর দিকে তাকালেন।

বিবেক বললেন—তবে কি, বলুন। চাপবেন না কিছু।

যমুনা—সুধা ওর জামাইবাবুর ব্যবসাটা ভাল চোখে দেখত না। সুধাকে বলতে শুনেছি, 'কোনদিন হাতকড়া পড়বে দেখছি।'

বিবেক হেসে বললেন, 'গাঁজা নাকি' ?

ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অবাক হয়ে বললেন, 'গাঁজা' ?

বিবেক—আপনারা 'গাঁজা' ছাড়েন নি আমাকে। আমি কিষণলালের কথাই বলছি। মৈথিলী যখন, তখন দ্বারভাঙ্গা জেলাতেই নিশ্চয় বাড়ি। আর দ্বারভাঙ্গার পরেই নেপাল সীমানা, গাঁজারই রাজ্য। ওদিকের লোকেরা গাঁজা স্মাগল্-এ সিদ্ধহস্ত। সেই ভেবেই বলছি। সেসব যাকৃগে। সুধার কাছ থেকে কখনও এমন কিছু শুনেছেন, যা সন্দেহজনক মনে হয় ?

যমুনা বললেন,—শুনেছি। আগে সন্দেহ হত না, এখন হয়।

বিবেক—যেমন ?

যমুনা—যেমন ধরুন, সুধা একদিন বলেছিল, 'দেখুন যমুনাদি, আপনার দেওরটির (অনন্তর) মাথায় একটু গোলমাল আছে।' আমি বললুম, 'কেন ?' সুধা বললে, 'সেদিন চান করে, কাপড়টা পাকাচ্ছি, উঁচু তারে ছুঁড়ে দেব বলে। উনিও (অনন্ত) আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। যেই একটু লাফ দিয়ে উঠে কাপড়টা ছুঁড়েছি, অমনি উনি আমাকে এমন ল্যাং মেরেছেন যে, আমি ছিটকে পড়ে গেছি। আর একটু হলে আমার মাথা ফেটে যেত।'

বিবেকের দুই চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। বললেন, তারপর ?

যমুনা—আমি বললুম, 'সেকি ?' সুধা বলল, 'হ্যাঁ। আমার

ভীষণ লেগেছিল। খুব রাগ হয়েছিল আমার। এ আবার কেমন ঠাট্টা! কিন্তু উনি (অনন্ত) হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন, যেন কিছুই জানেন না। কেমন যেন ভয় পাওয়া ভঙ্গিতে কাঁপতে লাগলেন। জানেন যমুনা দি, উনি যেন কেমন। সত্যি তো আর উনি আমাকে মারতে পারেন না, আর মেরে মিথ্যে কথাই বা বলবেন কেন শুধু-শুধু? কিন্তু আমি ভাবি, কে তাহলে এরকম মারল আমাকে? আমি যে স্পষ্ট দেখলুম, উনি মারলেন তারপর নিজেরই হাসি পেতে লাগল।' আমি বললুম, 'তোমার বোধ হয় মাথা ঘুরে গেছল সুধা।' সুধা বলল, তাই হবে।'

বিবেক যদিও তাকিয়েছিলেন যমুনার দিকে, তবু তার চোখে চিন্তার ঘোর। চিন্তিত স্বরেই জিজ্ঞেস করলেন, এতে আপনি সন্দেহজনক কি দেখতে পাচ্ছেন যমুনা দেবী?

যমুনা দৃঢ়স্বরে বললেন,—আমার বিশ্বাস, অনন্ত সুধাকে ইচ্ছা করেই ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিল। আপনি ওদের বাড়ির ভেতরের শান বাঁধান উঠোন দেখেন নি। কী ভীষণ পেছল। এমনিতেই মনে হয়, পড়ে গেলে হাড়গোড় ভেঙে যাবে। তাছাড়া, আরও এরকম ঘটেছে।

বিবেক উৎসুক হয়ে উঠলেন। বললেন, বলুন।

যমুনা বললেন ওদের দোতলার বারান্দার দক্ষিণ দিকে একটা স্বর্ণচাঁপা গাছ আছে। সুধাই আমাকে বলেছিল, 'দেখুন যমুনাদি, আজকে সারাদিন রাগারাগি হয়েছে আমাদের।' আমি বললুম, 'কেন?' সুধা বললে, 'একি মাথা খারাপ লোক দেখুন দিকিনি। জামাইবাবু কিষণলাল বসেছিলেন বারান্দায় চেয়ারে। আমি রেলিঙএ বুক চেপে ঝুঁকে একটা চাঁপা ফুলে হাত দিয়ে নাগাল পাবার চেষ্টা করছি। উনি (অনন্ত) আমার গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি যত বলছি, তুমি সর, উনি তত আমার দিকে চেপে আসছেন, আর বলছেন, তুমি ছেড়ে দাও, আমি দেখছি। আমি ওঁর কথা শুনি নি। হাত বাড়িয়ে

আমি তখন একটা সরু ডাল ধরেছি। জামাইবাবু হাসছিলেন। ডালটাকে ধরে ধরে টেনে টেনে, অনেকটা কাছে এনেছি, আর উনি (অনন্ত) যেন কিরকম শক্ত হয়ে উঠছিলেন। ফুলটা প্রায় এসে গেছে হাতের কাছে। ধরব ধরব করছি, এমন সময় হঠাৎ ডালটা মট্ করে ভেঙে গেল। আমি যেই চমকে গেছি, আর উনি (অনন্ত) আমাকে এমন জোরে ধাক্কা দিয়েছেন যে, আমি বারান্দার ওপরে ধপাস্ করে পড়ে গেছি। এই দেখুন না, আমার কপাল ঠুকে গেছে। উরুতেও কিরকম ব্যথা হয়েছে। আমি ওকে বললুম, ধাক্কা দিলে কেন? উনি বোকার মত তাকিয়ে দেয়ালের গায়ে চেপে কাঁপতে লাগলেন, আর বললেন, 'কোথায় ধাক্কা দিলুম!'…এসবের মানে কি যমুনাদি? যদি আমি নিচের দিকে পড়তুম, তাহলে তো মারা যেতুম। উনি কি আমাকে মেরে ফেলতে চান? আমি রাগ করে কথা বলি নি। জামাইবাবু ধাক্কা দিতে দেখেন নি, তাই উনি বোকার মত চুপ করেছিলেন।' যমুনা একটু দম নিয়ে বললেন,—আমি বললুম সুধাকে, 'তারপর রাগ কমল কি করে'? সুধা বললে,—'কি করে আবার! উনি (অনন্ত) আমার কাছে বারে বারে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। বললেন, 'বিশ্বাস কর সুধা, কিভাবে হয়ত লেগে গেছে, আমি তোমাকে ধাক্কা দিই নি। তারপরে অবশ্য আমারও মনে হতে লাগল, সত্যিই তো, শুধু-শুধু উনি আমাকে ধাক্কা দিতে যাবেন কেন? মাথা খারাপ তো নয়। তারপর আঁকশি তৈরি করে, নিজেই ফুলটা পেড়ে দিয়েছেন।'

যমুনা না থেমেই বললেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি, সুধাকে মারবার প্ল্যান অনন্তর আগে থেকেই ছিল। নইলে ওরকমভাবে কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারে না। আর মৃগী রুগীর মত ভাবটা ওর নির্ঘাৎ বদমাইসি। কই, আমাদের সামনে তো কখনো ওসব হয় না। তারপরে হয়ত ভেবেছে, ওখানে সুবিধে হবে না। আরও উঁচু জায়গা চাই। তাই, এ বাড়ি বেছে নিয়েছিল।

বিবেক যমুনা ও বিজনবাবুর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। বললেন, আপনাদের দৃঢ় বিশ্বাস, অনন্ত সুধাকে মারতেই চেয়েছিল?

বিজন—নইলে এসবের মানে কি থাকতে পারে বিবেকবাবু? এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে, আমাদের ছাদের ঘটনারও সাদৃশ্য নেই কি?

বিবেক—নিশ্চয় আছে। খুব বেশী রকম আছে। একই ঘটনা, কেবল স্থান বদলান হয়েছে। কখনও শান-বাঁধান উঠোনে, কখনও দোতলার বারান্দায়, শেষ পর্যন্ত চারতলার ওপরে। কিন্তু একই ব্যাপার। কিন্তু কেন বলতে পারেন?

বিজন—কিসের কেন?

বিবেক—এই সুধাকে মেরে ফেলার ইচ্ছে। কেন অনন্ত সুধাকে মারতে চেয়েছিল?

বিজন—সেটা তো আমরাও ভেবে পাচ্ছি নে।

যমুনা—এমনকি, বিমলার মত সুধার তো কোন গোলমাল ছিল না।

বিবেক—কি করে জানলেন?

যমুনা—মেয়েমানুষেরা সেটা সহজেই বুঝতে পারে বিবেকবাবু। আমি বুঝতে পারছি, আপনি কিষণলালবাবুকে সন্দেহ করছেন। কিন্তু আমি বলছি, কিষণলালের প্রতি সুধার কিছু মাত্র আসক্তি ছিল না। বরং অপছন্দই করত।

বিবেক—অনন্ত হয়ত সন্দেহ করত।

যমুনা—তাহলে বলতে হবে, সে একটি গাড়ল।

বিবেক গালে হাত দিয়ে খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপরে হঠাৎ বললেন, ডলিকে একটু ডেকে দিন।

ডলি এল।

বিবেক—আচ্ছা ডলি, তুমি লুকিয়েছিলে দেয়ালের পাশে, কেমন?

ডলি—হ্যাঁ।

বিবেক—একেবারে চুপটি করে না?

ডলি—হ্যাঁ।

বিবেক—তারপরে বুন্টুরা এল, কেমন ?

ডলি—হ্যাঁ।

বিবেক—এসেই ওরা চিৎকার করে উঠল, 'পেয়েছি পেয়েছি' না ?

ডলি—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

বিবেক—তুমিও খুব জোরে হেসে উঠলে ?

ডলি—হ্যাঁ।

বিবেক হঠাৎ, মানে আচমকা তোমরা সবাই হেসে চিৎকার করে উঠেছিলে, কেমন ?

ডলি- হ্যাঁ, আচমকা।

বিবেক—আর ঠিক তখুনি—

ডলি—সুধা কাকী পড়ে গেল।

বিবেক—আর অনন্ত কাকার হাত তখনও ওঠানো ?

ডলি—হ্যাঁ।

বিবেক তারপর ?

ডলি—তারপর উনি ছাদের ওপর পড়ে কেমন করতে লাগলেন।

বিবেক—হুঁ। আচ্ছা, তুমি যাও।

বিজনবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন বিবেকবাবু,—আচ্ছা, কতক্ষণ পর অনন্তবাবু ছাদ থেকে নেমে এসেছিলেন ?

বিজন প্রায় কুড়ি মিনিট পর, যখন আমি ডাকলাম। তখনো অনন্ত যেন ধরা পড়ার ভয়ে কিরকম করছিল।

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন বিবেক। তারপর বললেন, অদ্ভুত !

যমুনা- কি অদ্ভুত ?

বিবেক—এই অনন্ত ঘোষ দস্তিদার।

বিজন—অদ্ভুত কি মশাই, সর্বনেশে।

বিবেক—তাই বটে। ভয়ে আমি সেই জন্তেই custodyতেই রাখার অর্ডার দিয়েছি পরশু। কারণ, পালাবার কথা ও ভেবেছিল।

যমুনা—কোন্ সাহসে আপনি ওকে বাইরে রেখেছিলেন, তাইতেই অবাক হচ্ছিলাম।

বিবেক—ওকে একটু ভাল করে বোঝবার জন্তে। কিন্তু এ জায়গা অনন্ত ছাড়বার প্ল্যান করছিল। হয়ত লোয়ার কোর্টেই ওর শাস্তিবিধান হয়ে যাবে। হায়ার কোর্টে আপিলের সুযোগ দেওয়া হবে না। কারণ, ব্যাপারটাকে সবাই cold blooded murder বলেই মনে করছেন। আচ্ছা, আর একটা কথা। দোতলায় উঠে, প্রথম ঘরেই, অনন্ত আর সুধার ফটোর কাছে, আর একজন কার ফটো রয়েছে, জানেন?

যমুনা—দেখতে বেশ ভাল একটি ছেলের তো?

বিবেক—হ্যাঁ।

যমুনা—ওটা তো অনন্তরই।

বিবেক—অনন্তর?

যমুনা—হ্যাঁ, তাই তো জানি। ঢাকায় তোলা ফটো, অনন্তর বি-এ পরীক্ষার সময়।

বিবেক—তখন তো অনন্তর চোখ এরকম ছিল না।

বিজন—সে আর এক কাহিনী। মাজদিয়ার বিখ্যাত ট্রেন কলিশনের কথা আপনার মনে আছে?

বিবেক—ঢাকা মেল আর নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস তো?

বিজন—হ্যাঁ। সেই ট্রেনে অনন্ত ছিল। অনন্তর বাবা, মা, একমাত্র দাদা আর বউদি। য়্যাকসিডেন্টে সবাই মারা যায়। অনন্তকে উদ্ধার করা হয় অজ্ঞান অবস্থায়। তখনও ওর কাঁধে একটা কাঠের গোঁজা বিঁধে ছিল। অনন্ত আস্তে আস্তে ভাল হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু তিন মাস ও চোখের পাতা খুলতে পারে নি। ডাক্তাররা নাকি বলেছিল, অজ্ঞান হবার আগে এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছিল অনন্ত যে, ভয়ে সেই যে চোখ বন্ধ করেছে, আর খুলতে চায় নি। হয়তো বা অন্ধ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তিন মাস বাদে যখন অনন্ত একটু

একটু করে চোখ খুলতে লাগল, তখন টের পাওয়া গেল, ওর ডান চোখের পাতাটা প্যারালাইজড্ হয়ে গেছে। অনেকদিন ওষুধ-বিষুধ ম্যাসেজ করা হয়েছে, কিন্তু ফল হয় নি। এখনও আশা ছাড়ে নি, কি একটা ওষুধ মাখে যেন চোখের পাতায়।

বিবেক একেবারে নির্বাক। ক্রমেই যেন গাঢ় চিন্তায় ডুবে যাচ্ছিলেন। কেবল বললেন, নতুন কথা শোনালেন।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, আচ্ছা, শুনেছি অনন্ত রেলগাড়ি কিংবা বাসে চাপে না, সত্যি?

যমুনা—হ্যাঁ। রিক্সাতেই চাপতে চায় না। চাপলেও রিক্সাওয়ালাকে আগেই বলে দেয়, খুব আস্তে চালাতে হবে।

বিজন—অর্থাৎ স্পীড সহ্য করতে পারে না।

বিবেক—হুঁ। আচ্ছা চলি। আপনারা কাল কোর্টে আসতে ভুলবেন না।

ইতিমধ্যে মামলার কয়েকদিন শুনানী হয়ে গিয়েছে।

মহকুমা হাজত। আণ্ডার ট্রায়াল সেল। অনন্ত চুপ করে বসে আছে। বিবেক এলেন নিশঃব্দে। পিছন থেকে হঠাৎ ভীষণ জোরে হেঁচে ফেললেন।

অনন্ত চমকে উঠল।

বিবেক হাসলেন। বললেন, ক্ষমা করবেন। বিশ্রী সর্দি হয়েছে। আপনার কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছি অনন্তবাবু।

অনন্ত মুখ ফিরিয়ে স্বরহীন গলায় বলল, দুবার ফাঁসী দিতে যাতে পারেন, সেই আর্জি?

বিবেক—না। আপনি হয়তো আমার ওপর চটেছেন য়্যারেস্ট করার জন্য। কিন্তু সরে পড়তে আপনি চেয়েছিলেন কিনা বলুন।

অনন্ত—আপনি সরে পড়ার যে অর্থ করেছেন সেই অর্থে নয়।

আমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে চাইছিলুম যতদিন আপনাদের বিচার শেষ না হয়।

বিবেক—আপনি এটা যত সহজে বলছেন, আমরা তত সহজে ভাবতে পারি নে।

অনন্ত—যাকগে, আপনার আর্জির কথা বলুন।

বিবেক—সেইটিই বলছি। অনন্তবাবু, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। হয়তো এর ভেতরের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি।

অনন্ত—কি বুঝতে পেরেছেন?

বিবেক—সেটা এখন আমি বলতে পারব না। আপনি শুধু দয়া করে আমাকে বিমলা দেবীর দ্বিতীয় চিঠিটা দিন।

অনন্ত—আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, বিমলার দ্বিতীয় চিঠির সঙ্গে সুধার ব্যাপারের কোন যোগাযোগ নেই।

বিবেক—আমি আন্তরিক ভাবেই তা বিশ্বাস করি। আর সেইটে প্রমাণের জন্যই চিঠিটা আপনি দয়া করে দিন।

অনন্ত—সেটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত, আইনের কাছে তার কোন মূল্য নেই।

বিবেক—আছে, আছে অনন্তবাবু। বিশ্বাস করুন।

বলতে বলতে বিবেকবাবুর গলা গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন,—অনন্তবাবু, সুধাকে আপনি মেরে ফেলেছেন ঠিকই। আমি জানি নে, হয়তো আপনি নিজের প্রাণের মূল্য অল্পজ্ঞান করছেন। করতে পারেন। কিন্তু বিমলার মৃত্যুর দায় যদি আপনার ওপর থেকে উঠে যায়, তবে সুধার মৃত্যুর দায় থেকেও আপনি রেহাই পেতে পারেন।

অনন্ত—কি করে?

বিবেক—সেটা আমি এখন বলব না। দোহাই অনন্তবাবু প্রাণের চেয়েও কলঙ্ক অনেক বড়। আপনি বিমলাদেবীর চিঠিটা দিন আমাকে।

অনন্ত তার একটি অপলক চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল

বিবেকের দিকে। তারপর বলল,—আপনি যে কি বলছেন, বুঝতে পারছি নে।

বিবেক—পরে বুঝতে পারবেন।

অনন্ত মুখ ফিরিয়ে বলল,—আমার শোবার ঘরের আলমারিতে, একটা মোরাদাবাদী পেতলের ফুলদানীর তলায় চাপা দেওয়া আছে চিঠিটা।

বিবেক এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে চলে গেলেন।

দীনেশবাবু আর অরুণকে সঙ্গে করে, বিবেকবাবু এলেন অনন্তের বাড়িতে। চাবি চাকরের কাছেই ছিল। বিবেক আগে চিঠিটা বার করলেন। তারপর পড়তে পড়তে ওঁর মুখ হাসিতে ভরে উঠল।

ও-সি দীনেশ বললেন, কি ব্যাপার? কি যেন প্রমাণ করবেন বলছিলেন?

বিবেক বললেন, করব, করব দীনেশবাবু। আমি এইটিই আশা করেছিলুম। শুনুন বিমলার চিঠি:

প্রিয়তমেষু,

এ নামে তোমাকে ডাকবার অধিকার আমার নেই। কোনকালেই ছিল না। আজ শেষবারের জন্য ডেকে গেলাম, কারণ তুমি তো সত্যি এ মুখপুড়িকে ভালবেসেছিলে। কিন্তু এত ভালবাসার প্রতিদানে, আর কত দিন তোমাকে প্রবঞ্চনা করব? গেনুর ব্যাপার তো তুমি জানই। তোমার বুকে অষ্টপ্রহর জ্বলছে। তোমার মত মানুষ কখনও মুখ ফুটে সে-কথা তার স্ত্রীকে বলতে পারে না। তাছাড়া তুমি যে সত্যি ভালবেসেছ! কেমন করে গেনুর কথা উচ্চারণ করবে তুমি। তাই তোমাকে মুক্তি দিতে চাই আমি। কারণ তোমার স্ত্রী হয়েও অকপটে বলছি, গেনুর হাতছানি আমি ফেরাতে পারি নি। কিন্তু গেনুরও সাহস নেই. আমাকে নিয়ে ঘর করে। একদিকে এক ভীরু

পুরুষের প্রতি আমার আকর্ষণ, অন্যদিকে প্রেমিক স্বামীকে প্রতিদিন প্রবঞ্চনা, এ চলতে পারে না। তাই, এই সর্বনাশীকে বিদায় দাও।

প্রথম প্রথম তোমাকে অনেকরকম সন্দেহ করেছি। মনে আছে সেই রিকশায় ওঠার কথা? তুমি আর আমি। রিকশাটা মোড় বেঁকতেই সামনে লরী। তুমি হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। লোকে এসে আমাকে তুলল। তুমি বললে, মোটেই ধাক্কা দাও নি। আমার সন্দেহ হয়েছিল, তুমি বুঝি আমাকে মেরে ফেলতেই চাও। পরে বুঝেছি, সব মিথ্যে। তুমি আমাকে ধাক্কা দিতে পার না ;—

পড়তে পড়তে থেমে গেলেন বিবেক। বললেন, ব্যস্, আর পড়বার দরকার নেই। বুঝতে পারছেন এবার, বিমলার ব্যাপারে অনন্তর কোন প্রোভেকশন্ নেই?

অরুণ—তা বুঝতে পারছি স্যার। কিন্তু ধাক্কাটা?

বিবেক—ধাক্কাটা অবশ্য দিয়েছিল অনন্ত।

দীনেশ—তাতে তো বিমলা লরীর নীচে গিয়ে মরে যেতে পারত?

বিবেক—হ্যাঁ, তাও পারত।

দীনেশ—তবে?

বিবেক—এবার সেইটেই দেখতে হবে। সেইজন্যেই, কাল সকালে, অনন্তকে নিয়ে জীপে করে বেরুব। দীনেশবাবু থাকবেন আমার সঙ্গে। অরুণ তুমি ঠিক দশটা চল্লিশ মিনিটে বৈকুণ্ঠপুরের নিউকর্ড রোডের মসজিদের কাছে, ডেড্‌কার্ভের উল্টোদিক থেকে, হেভী ট্রাকটা আস্তে আস্তে চালিয়ে নিয়ে আসবে। তুমিও আসবে, আমিও কার্ভে ঢুকে যাব। তারপর একেবারে ডেড্‌স্টপ, কেমন?

অরুণ—আচ্ছা স্যার।

মহকুমা হাজতের বাইরের লনে জীপ দাঁড়িয়ে। অফিসের ভিতর

বিবেক বললেন দীনেশকে, আপনি গাড়ির পিছনে বসবেন। কিন্তু খুব সাবধান! হুঁশিয়ার থাকবেন, অনন্তর ওপর থেকে একবারও চোখ সরাবেন না। ওকে ঠিক সময়ে ধরে ফেলবেন।

একজন সেপাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে এল অনন্ত।

বিবেক বললে, চলুন একবার আপনার বাড়ি যাব।

অনন্ত—কেন ?

বিবেক—দরকার আছে।

অনন্ত সন্দিগ্ধ চোখে, এক চোখের ঠাণ্ডা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সবাইকে একবার দেখে নিয়ে বলল, চলুন।

বিবেক বাইরে এসে বললেন, উঠুন গাড়িতে।

অনন্ত অস্বাচ্ছন্দ বোধ করল। বলল, জীপে ?

বিবেক—হ্যাঁ।

অনন্ত পেছন দিকে উঠতে গেল। বিবেক বললেন,—না-না, সামনে চাপুন, আমার পাশে।

অনন্ত থমকে দাঁড়িয়ে বলল, পালাব না মশাই। কিন্তু সামনে উঠতে পারব না।

বিবেকের সঙ্গে দীনেশের চোখাচোখি হল। দীনেশ রাশভারি গলায় বললেন,—বিবেকবাবু যা বলছেন, তাই করুন।

বিবেক বললেন শান্ত গলায়, ভয় নেই, উঠুন, আমি খুব আস্তে চালাব। জানি আপনি স্পীড সহ্য করতে পারেন না।

অনন্তর ভাবলেশহীন মুখে কোন ভাবই ফোটে না। তবু তার একটি চোখে যেন শঙ্কার ছায়া দেখতে পেলেন বিবেক। হাতের ঘড়ি দেখলেন, ঠিক সাড়ে দশটা।

অনন্ত যেন হেঁচড়ে হেঁচড়ে গাড়িতে উঠল। বিবেক বসলেন ড্রাইভ করতে। দীনেশ পিছনের সীটে।

গাড়িটা প্রথমে আস্তে আস্তে চলল। কিন্তু বিবেক দেখলেন, অনন্তর হাত মুঠি পাকিয়ে উঠছে।

গাড়ি চলছে, গাড়ি চলছে, হঠাৎ সামনে একটা সাইকেল-রিকশা।

অনন্ত বিবেকের গায়ের কাছে চেপে এল।

বিবেক বললেন,—ভয় পাচ্ছেন।

অনন্ত অত্যন্ত মোটা ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,—না।

বিবেক স্পীড দিলেন। পথের ওপরে একটি ছোট ছেলে। বিবেক হর্ণ দিলেন না। গাড়িটা যেন সোজা ছেলেটার দিকেই এগুচ্ছে।

বিবেক অনুভব করলেন, অনন্তর কনুইটা ওঁর পাঁজরে চেপে বসছে আস্তে আস্তে। আরও দেখলেন, স্টার্টারের ওপর ওঁর পায়ের পাশে অনন্তর পা এগিয়ে এসেছে।

ছেলেটা সরে যাবার আগেই, বিবেক বলে উঠলেন,—অনন্তবাবু, আপনি আমার পাঁজরে কনুই খোঁচাচ্ছেন।

অনন্ত তাড়াতাড়ি কনুই সরিয়ে বলল,—কই, না তো!

ছেলেটা রাস্তা পার হল। বিবেক গাড়ি দাঁড় করালেন। আঙুল দিয়ে পায়ের দিকে দেখিয়ে বললেন অনন্তকে,—দেখুন, আপনি আমার পা মাড়াচ্ছেন।

চট্ করে পাটা সরিয়ে বলল অনন্ত,—কই না তো।

বিবেকেবাবু কিছু না বলে ঘড়ি দেখলেন, দশটা সাঁইত্রিশ।

হঠাৎ হাইস্পীডে গাড়ি বাঁক নিয়ে এক মিনিটের মধ্যে বৈকুণ্ঠপুর নিউকর্ড রোডে এসে পড়ল। সামনে ফাঁকা রাস্তা। ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ি চালালেন বিবেক।

অনন্ত ততক্ষণে বিবেকের গায়ে ঠেসে এসেছে, আর তার হাত দুটি অবিকল স্টিয়ারিং হুইল ধরার ভঙ্গিতে উঠে পড়েছে।

বিবেক একবার বললেন চাপা গলায়,—অনন্তবাবু, আপনি আমাকে ঠেসছেন।

অনন্ত বলল,—কই, না তো!

কিন্তু সে একটুও সরল না। উপরন্তু বিবেকের পায়ের ওপর অনন্তর একটি পা যেন ধনুষ্টংকার রোগীর মত বেঁকে এসে পড়ল।

বিবেক—অনন্তবাবু, পা সরান।

পা সরল না। অনন্ত বলল চাপা আর্ত গলায়,—পা ঠিকই তো আছে।

গাড়িটা যেন উড়ছে। বনেট কাঁপছে থরথর করে।

সামনে মসজিদের ডেডকার্ড। রাস্তা দেখা যায় না, শুধু মসজিদের দেয়াল।

অনন্ত সামনের দিকে ঝুঁকল। হাত তার হুইলের কাছে।

ট্রাকের হর্ণ শোনা গেল উল্টো দিক থেকে। কিন্তু ট্রাক দেখা যাচ্ছে না।

জীপ তবু এগুচ্ছে একই স্পীডে। সোজা দেয়াল বরাবর চলেছে।

হঠাৎ সামনে ট্রাক।

বিবেক চিৎকার করে উঠলেন,—গেলাম! সর্বনাশ!

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অনন্তর ডান হাতের মুঠিটা সজোরে এসে পড়ল বিবেকের ওপর, এবং এক ধাক্কায় তিনি অনেকখানি সরে গেছেন।

কিন্তু গাড়ি তখন ডেড স্টপ।

দীনেশবাবু যদিও তখন দু-হাতে জাপটে ধরেছেন অনন্তকে, বিবেকবাবুর চোয়ালের দাঁত ততক্ষণে সড়ে গেছে। মুখের কষে রক্ত। গালে হাত চেপে বিবেক বললেন,—চোখের পলকে কত তাড়াতাড়ি অনন্তবাবুর হাত উঠে এল, টেরও পেলেন না, দীনেশবাবু।

দীনেশ বোকার মত বললেন,—তাই তো!

অনন্ত তখন কাঁপছে ঠক্ঠক্ করে, আর তার অপলক একটি চোখ আরও বড় হয়ে উঠেছে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে আর হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন। হাতটা তার তখন ট্রাফিক পুলিশের মত তোলা। এত শক্ত, যেন

কিছুতেই নামবে না। বিবেকের সঙ্গে তার চোখা-চোখি হল। বিবেকও তাকিয়েছিলেন।

কয়েক মুহূর্ত একেবারে স্তব্ধ, শূন্য। অনন্ত হাত নামাল।

বিবেকবাবু অনন্তর কাছে সরে এসে, ফিস্‌ফিস্ করে বললেন,—সুধার অনুরোধেই আপনি আল্‌সের ধারে বসেছিলেন, না?

নিস্তেজ, সুরহীন গলায়, সেও প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল,—হ্যাঁ।

—আপনার ভয় লাগছিল, না?

—হ্যাঁ।

—সুধার জন্য, না?

—হ্যাঁ।

—আর ঠিক সেই সময়েই বাচ্চারা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিল?

—হ্যাঁ।

—সুধা চমকে আপনাকে ধরতে আসছিল?

—হ্যাঁ।

আপনি ঠিক সেই সময়েই চমকে, সুধাকেই ধাক্কা দিয়েছিলেন, কেমন?

—হ্যাঁ।

—আর দেখলেন, সুধা পড়ে গেল?

অনন্ত দু' হাতে মুখ ঢাকল।

বিবেক অনন্তর কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বললেন,—আপনার জন্য বড় কষ্ট হয় অনন্তবাবু। ডাক্তারবাবুরা কি বলবেন জানি নে, আপনি মারাত্মক রকম অসুস্থ। এই ব্যাধি আপনার কোনদিন সারবে কিনা জানি নে। আধুনিক ডাক্তারেরা এ রোগের কি নাম দেবেন, তাও জানি নে।

অনন্ত তবু মুখ তুলল না।

বিবেক আবার বললেন,—সুধাকে ধাক্কা দিয়ে আসার পর, থানায় বসে আপনি যখন অরুণের হাতে ছুরি দেখে মুঠি পাকাচ্ছিলেন, তখুনি

আমার সন্দেহ হয়েছিল। আজ তার সুরাহা হল। মাঝে বিমলা দেবীর চিঠিটাই গোল পাকিয়েছিল। তাতেও আপনারই সবচেয়ে বড় নির্দোষ সার্টিফিকেট আছে। আপনার ব্যাধিই সুধাকে মেরেছে, আপনি নন। অনন্তবাবু!

ভাঙা ভাঙা গলায় জবাব এল,—বলুন।

বিবেক—সেই জন্যেই আপনি বড় ঘর ভালবাসেন, অনেক বড় জায়গা চান, ধীরে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াবার মত, বসবার মত, অনেকখানি space চান, যাতে কখনও হঠাৎ কারুর সঙ্গে ধাক্কা না লাগে। গায়ে গায়ে চাপাচাপি করতে না হয়, না?

—হ্যাঁ।

—চিৎকার, গোলমাল বা কোন উত্তেজনাকর কিছু দেখলেই, আপনি নিজেরই অজান্তে সাংঘাতিক ইন্‌ভল্‌ভড্‌ হয়ে পড়েন। আপনার হাত পা আপনার অনিচ্ছায় কাজ করে যায়, নয়?

—হ্যাঁ।

বিবেক দু-হাত দিয়ে অনন্তের মুখের ঢাকনা খুলে বললেন, বাড়ি যান অনন্তবাবু!

অনন্তর মুখ নত। বলল, আমার বিচার?

বিবেক বললেন,—আপনার বিচার চিকিৎসা।

অনন্তর চোখের কুল ছাপিয়ে জল এল। বলল,—না বিবেকবাবু। বিমলা গলায় দড়ি দিয়েছে। সুধাকে আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি। আর আমার এই দুরারোগ্য ব্যাধি। আমি আর বাঁচতে চাই নে। আপনারা আমাকে খুনীর শাস্তি দিন।

বিবেক বললেন,—তার মানে, আপনাকে মেরে, আমরা খুনী হব, না? হেসে উঠে বললেন, চলুন ভাই, আমরা সবাই আপনার আরোগ্য কামনা করি।